পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্র

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

মাঘ, ১৩৩০

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস

চন্দননগর

চন্দননগর, বোড়াইচণ্ডিতলা
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস হইতে
শ্রীরামেশ্বর দে
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
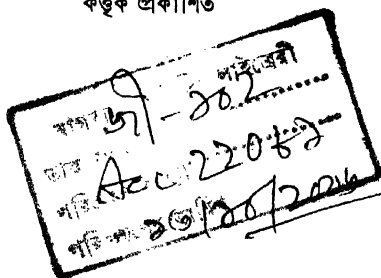
মূল্য দশ আনা

লেখকের বক্তব্য

ঠিক দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩১৮ সালে পরম প্রীতিভাজন সুহৃদ স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির অনুরোধে তাঁহার সম্পাদিত 'সাহিত্যে'র কয়েক সংখ্যায় 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গে'র আলোচনা করিয়াছিলাম। সুরেশ বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন অরবিন্দ যখন বরোদায় ছিলেন, তখন অধিকাংশ বাঙ্গালী তাঁহাকে জানিত না, চিনিত না। গুর্জ্জর ভূমির মরুবক্ষে কি রত্ন লুক্কায়িত ছিল—কেহই তাহার সন্ধান পায় নাই; কিন্তু সেই দীর্ঘ কালের মধ্যে সুদূর প্রবাসে তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ সৌভাগ্যক্রমে আমিই কিছুকালের জন্য লাভ করিয়াছিলাম। এখন সেই সকল কথা শুনিবার জন্য নবীন বঙ্গের আগ্রহ হইয়াছে; সুতরাং 'সাহিত্যে' অরবিন্দ-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয় যুবকসমাজে তাহা সমাদৃত-হইবে।

সে বার বৎসর পূর্ব্বের কথা। আজ সুরেশ বাবু নাই, তাঁর বড় সাধের 'সাহিত্য'ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশতঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল কয়েক মাসের 'সাহিত্যে' 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে; আর কিছু দিনের মধ্যেই তাহা লোকলোচনের অন্তরালে অদৃশ্য হইত।

কিন্তু সুরেশ বাবু যে উদ্দেশ্যে অরবিন্দ প্রসঙ্গের প্রকাশ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান। আজ লক্ষ-লক্ষ বাঙ্গালী পাঠক অরবিন্দের অতীত জীবনের কথা শুনিবার জন্য আগ্রহবান। এই দ্বাদশবৎসর পরে সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বের এই স্মৃতিকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' 'সাহিত্যে' যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু লিখিবার ছিল,—আমি তাহা এই গ্রন্থে সংযোজিত করিলাম। আশা করি ভারতজননীর এই একনিষ্ঠ তপস্বী সেবকের পুণ্যকথা বঙ্গীয় যুবকসমাজে অনাদৃত হইবে না।

রাস-পূর্ণিমা;
অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এত অল্পদিনের মধ্যে এরূপ বিখ্যাত হইয়া উঠিবেন, সমগ্র ভারতের পুলিশ-বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইবে, এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব তাঁহাকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতের দরিদ্রপ্রজার শোণিততুল্য সহস্র সহস্র মুদ্রা 'শ্যাম্পেন'-পানি অপেক্ষাও সহজে গলাধঃকরণ করিবেন, বোমার মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, এ কথা আমার কল্পনার অতীত ছিল। বোধ হয়, অন্য কাহারও কল্পনাতেও তাহা উদিত হয় নাই; এমন কি, এইরূপ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা অরবিন্দও স্বয়ং কখনও কল্পনা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু কল্পনাতীত অনেক ব্যাপার মানব-জীবনে নিত্য ঘটিতে দেখা যায়; সুতরাং অরবিন্দকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমলাতন্ত্রের এই অয়োজনে আমরা বিস্মিত হই নাই।

অরবিন্দ এইরূপ খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করিবার পর ইংরাজি ও বাঙ্গলা অনেক কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বাহির হইয়াছে। শুনিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে কে একজন পালিত তাঁহার একখানি জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া দেশ বিদেশে তাঁহাকে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অরবিন্দ এখনও যৌবনের সীমা অতিক্রম করেন নাই; এখনও তাঁহার জীবনাখ্যায়িকা লিখিবার সময় আসে নাই। বিশেষতঃ, জীবিত ব্যক্তির জীবনচরিত প্রকাশ নানা কারণে সঙ্গতও নহে; তবে গরজ বড় বালাই। যাঁহার জীবনের কাহিনী বিক্রয় করিলে দু'পয়সা লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহাকে অসময়ে আসরে নামাইয়া নাচাইবার লোভ সংবরণ করা অনেকেরই পক্ষে কঠিন। আমি জানি, অরবিন্দ এরূপ নৃত্যের পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিবার জন্য অনেকেই আগ্রহপ্রকাশ করেন; এবং আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বাঙ্গলাদেশে যাহারা মানুষের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা অরবিন্দের জীবনকথার আলোচনা করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবে। এই জন্যই অরবিন্দ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের পর লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি।

অরবিন্দের কর্ম্মজীবনের প্রথমাংশ কয়েকবৎসর বরোদায়

অতিবাহিত হইয়াছিল। বরোদায় তাঁহার প্রবাস-যাপন সম্বন্ধে তাঁহার জীবন-আখ্যায়িকালেখকগণের আলোচনাযোগ্য কোনও কথা জানিবার সম্ভাবনা আছে কি না সন্দেহ। কারণ, সেই সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার প্রায় কোন সম্বন্ধ ছিল না; বরং তাঁহার মারাঠী বন্ধুরা তাঁহার জীবনের এই সময়ের ঘটনা কিছু কিছু অবগত আছেন। আমিও অল্প যাহা জানি তাহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শীতের প্রারম্ভে, বোধ হয় পূজার কয়েক সপ্তাহ পর, আমি অরবিন্দকে বাঙ্গলা ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া বরোদায় যাই। সে বার বৎসর পূর্ব্বের কথা। অরবিন্দ আবাল্য ইংলণ্ডপ্রবাসী, পাঁচছয় বৎসর বয়স হইতে যৌবনারম্ভের পর পর্য্যন্ত বিলাতেই ছিলেন; এজন্য মাতৃভাষা শিক্ষার তেমন সুযোগ পান নাই। বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ থাকায় ভাল করিয়া বাঙ্গলা শিখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। যিনি ইউরোপের নানা ভাষায় সুপণ্ডিত, তিনি মাতৃভাষায় একখানি চিঠি লিখিতে পারেন না, এমন কি, বাঙ্গালীর মত বাঙ্গলা কথা বলিতে পারেন না! ইহা বোধ হয় তিনি অমার্জ্জনীয় ত্রুটি মনে করিতেন। সেই জন্য

অরবিন্দের মাতুল স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু (প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র) মহাশয় আমাকে অরবিন্দের বাঙ্গলা ভাষার 'গুরুমশায়গিরি' করিবার যোগ্য-পাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে রাজনারায়ণ বাবু তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি কলিকাতা হইতে অরবিন্দের সঙ্গেই দেওঘর যাই। সেখানে যোগীন বাবুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। অরবিন্দ তখন ছুটীতে দেশে আসিয়া দেওঘরে (মাতুলালয়ে) অবসর যাপন করিতেছিলেন; এবং কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া মাসীর বাড়ীতে ছিলেন। সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় অরবিন্দের মেসো মশায়।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া, আমি যে আদর যত্ন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইব না। যোগীন বাবু আমাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। আমরা উভয়েই সাহিত্য-সেবক বলিয়াই, বোধ হয় প্রথম পরিচয়েই এই অপরিচিত যুবক তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রগাঢ় স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। সেই ব্রহ্মচর্য্যরত চিরকুমার প্রৌঢ়ের হৃদয় শিশু-হৃদয়ের ন্যায় সরল সুকোমল স্নেহ-মধুর ছিল। আর পূজনীয় রাজনারায়ণ বাবুর কথা

নূতন করিয়া কি বলিব? তখন তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। শরীর কঙ্কালসার, চুল দাড়ি গোঁফ সমস্তই তুষারশুভ্র; কিন্তু তাঁহার নিষ্প্রভপ্রায় নেত্রে স্বর্গের জ্যোতিঃ ও পবিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। জীবন ধন্য মনে হইল। তিনি রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই বাঙ্গলা ও ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে, সেকাল ও একাল সম্বন্ধে কত কথারই আলোচনা করিয়াছিলেন! বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনার সময় যেন তাঁহার যৌবনের উৎসাহ ফিরিয়া আসিত; রোগযন্ত্রণা প্রশমিত হইত! মনে পড়িতেছে—বিদায়ের দিন তিনি আমাকে স্নেহালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া, আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, "তোমার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক।" এমন প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ আর কখন কাহারও নিকট পাইয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। সেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ—প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ। তাহার পরও বরোদা যাইবার সময় প্রত্যেক বারই অরবিন্দের সঙ্গে দেওঘর দিয়া গিয়াছি; কিন্তু রাজনারায়ণ বাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া তেমন সুখ আর কখনও পাই নাই। দেব-গৃহের দেবতা মন্দির শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, শূন্য মন্দিরের আর কোনও আকর্ষণ ছিল না; কেবল

তাঁহার পবিত্র স্মৃতি পুষ্পগন্ধের ন্যায় সেই পবিত্র ভবন তখনও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। যোগীনবাবুকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, "আপনার বাবা খুব হাসিতে পারেন, এমন প্রাণ খুলিয়া আর কাহাকেও হাসিতে দেখি নাই; এই দারুণ রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়াও এত হাসি!" আমার কথা শুনিয়া যোগীন বাবু বলিয়াছিলেন, "এ ত কি হাসি দেখিলেন, বাবা যখন দ্বিজেন্দ্র বাবুর (রাজনারায়ণ বাবুর পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সঙ্গে গল্প করেন, আর দুই বন্ধুতে হাসিতে থাকেন, তখন মনে হয় বাড়ীর ছাদটা বুঝি হাসির তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে!" —এখন আমরা অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হইতেছি, প্রাণ-খোলা হাসিকে আমরা এখন 'ছেলেমানুষী'র চিহ্ন মনে করিতে শিখিয়াছি, অকালপক্কতায় ও গাম্ভীর্য্যে আমাদের হাড়ে ঘুণ ধরিবার উপক্রম হইয়াছে; তাই প্রসঙ্গক্রমে এ কথাটার উল্লেখ করিলাম। যোগীন্দ্রবাবু উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি ও তাঁহার ছোট ভাই মুণীন্দ্রবাবু যেমন সরল ও অমায়িক, সেইরূপ সুরসিক, সাহিত্যানুরাগী, পরোপকারী ও নিরলস। যোগীন্দ্রবাবু বহু ইংরাজী কাগজের লেখক ছিলেন। সাহিত্যসেবাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল।

অরবিন্দকে বাঙ্গলা পড়াইতে হইবে ভাবিয়া প্রথমে

আমার বড় ভয় হইয়াছিল। অরবিন্দ প্রগাঢ় পণ্ডিত লোক, সিভিল সার্ব্বিসের পরীক্ষায় তিনি লাটীন ও গ্রীকে এত অধিক 'নম্বর' পাইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে দেশী বিলাতী কোনও পরীক্ষার্থীই উক্ত দুই ভাষায় তত বেশী নম্বর (Record mark) পান নাই! লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দ রাশি রাশি পুস্তক 'প্রাইজ' পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে বিলাতের 'কামশাস্ত্র সোসাইটী' হইতে প্রকাশিত আরব্য-উপন্যাসের শোভন সংস্করণ তাঁহার পাঠাগারে দেখিয়াছিলাম; অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত ও শব্দকল্পদ্রুম তাহার তুলনায় ক্ষুদ্র গ্রন্থ! আরব্য-উপন্যাসের এমন বিরাট দেহ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; যেন ষোলখানি 'ওয়েবেষ্টার ডিক্সনারী'! তাহার ছবিও অসংখ্য।

অরবিন্দকে দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম তাহা এইরূপ;—সাহিত্য-সম্পাদক বন্ধুবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ন্যায় প্রকাণ্ড জোয়ান; চোখে চশমা, অধিকন্তু আপাদমস্তক হ্যাটকোট-বুটে মণ্ডিত; মুখে বাঁকা বাঁকা বুলি চক্ষুতে কটু-মট চাহনি, মেজাজ ভয়ঙ্কর রুক্ষ! মনে হইয়াছিল 'পান হইতে চুণটুকু খসিলেই' বুঝি সর্ব্বনাশ! বিলাত

দূরের কথা, বোম্বাই পর্য্যন্ত না গিয়াই অনেকে যখন 'হনুকরণে'র মোহে উৎকট 'গোরাত্ব' লাভ করে, তেলা-পোকা কাঁচপোকা হইয়া যায়,—তখন আঠার বিশবৎসর বিলাতে বাস করিয়া অরবিন্দ না জানি কি বিকট জানোয়ারত্ব লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া হৃৎকম্প হইল!

সুতরাং বলা বাহুল্য, অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে আহম্মদা-বাদের মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা খাদি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আঁটো মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতা-পুর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরাজী ফরাসী, লাটিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান্ অরবিন্দ ঘোষ! দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত,—'ঐ হিমালয়', তাহা হইলেও বোধ হয়, তত দূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না!—যাহা হউক, দুই একদিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম, অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁহার হাসি শিশুর হাসির মত সরল তরল ও সুকোমল। হৃদয়ের অটল সঙ্কল্প ওষ্ঠপ্রান্তে আত্ম-

প্রকাশ করিলেও মানবের দুঃখে আত্মবিসর্জ্জনের দেবদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সে হৃদয়ে পার্থিব উচ্চাভিলাষের বা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। অরবিন্দ তখনও বাঙ্গালায় কথা বলিতে পারিতেন না; কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিবার জন্য তাঁহার কি প্রগাঢ় ব্যাকুলতা!—দিবা-রাত্রি একত্র বাস করিয়া ক্রমে যতই অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম, অরবিন্দ এ পৃথিবীর মানুষ নহেন; অরবিন্দ শাপভ্রষ্ট দেবতা। ভগবান কি ভাবিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালী করিয়া অভিশপ্ত ভারতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তা তিনিই বলিতে পারেন। বাল্যকালে মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়া যিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, এবং যৌবনারম্ভের অনেক পরে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন, বিলাতী সমাজের ব্যসন ও বিলাসিতা, চাকচিক্য, বিবিধ সংস্কার এবং বিচিত্র মোহ তাঁহার মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত উদার হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল। বরোদা ক্যাম্পের একটি দ্বিতল বাঙ্গালায় আমাদের অবস্থান কালে একটি বাঙ্গালী যুবক (তিনিও ঘোষ) ইংলণ্ড হইতে দেশে ফিরিয়া বরোদায় গিয়াছিলেন; বরোদা গবর্মেণ্টের মধ্যে একটা চাকরী জুটাইয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি প্রথমে বরোদা ক্যাম্পের ডাক বাঙ্গলায়

উঠিয়াছিলেন, পরে অরবিন্দকে মুরুব্বি ধরিবার জন্য আমাদের বাসায় আসেন। দুইতিন বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়াই তিনি বেজায় সাহেব হইয়াছিলেন! তাঁহার ও অরবিন্দের চাল চলনে আকাশ পাতাল তফাৎ দেখিয়া একদিন আমি অরবিন্দকে এই শ্রেণীর বিলাতফেরত নকল গোরাদের উৎকট সাহেবীয়ানার প্রসঙ্গে বলিলাম,—"যাহারা বিলাতে যাইবার নাম করিয়া বাহির হয়, এবং বোম্বাই পর্য্যন্ত গিয়াই সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া পলাইয়া আসে,—তাহাদেরই উৎকট সাহেবিয়ানার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয়; দু'তিন বৎসর যারা বিলাতে বাস করিয়া আসে, তাহাদের ত কথাই নাই! কিন্তু আপনি আশৈশব এতকাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া আসিলেন, অথচ আপনাকে পুরা বাঙ্গালী দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?" আমার প্রশ্ন শুনিয়া অরবিন্দ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বিলাতে যাইলে প্রথমটা সে দেশের বাহ্য চাক্‌চিক্যে অন্ধ হইতে হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিলে সে অন্ধত্ব কাটিয়া যায়; কি ভাল, কি মন্দ, তাহা বুঝিবার শক্তি জন্মে। যাঁহারা বিলাতে গিয়া তিন বৎসরেই পুরা সাহেব হইয়া আসেন, এবং মোচাকে 'কেলাকা ফুল' বলেন, মায়ের ভাষা প্রায় ভুলিয়া যান, এবং স্বগ্রামে ফিরিয়া বাড়ীতে টেবিলের অভাবে

ধামা উল্টা করিয়া, তাহার উপর লোহার সান্‌কী রাখিয়া উভয় হস্তে কাঁটা চামচে ব্যবহার করেন, 'অক্স-টং' ও 'হ্যাম' ভিন্ন (এমন কি, অভাবে গোবর পর্য্যন্ত!) আর কিছু যাঁহাদের মুখে রোচে না, তাঁহারা আঠার বিশ বৎসর বিলাতে বাস করিয়া কিম্ভূতকিমাকার ফিরিঙ্গী না হইয়া মায়ের ছেলের মত এই ভুবনমনোমোহিনী সূর্য্যকরোজ্জ্বলধরণী জননী ভারতলক্ষ্মীকে মায়ের ভক্তি ও সম্মান প্রদান করিবেন —ইহা না দেখিলে কি কেহ বুঝিতে পারে?

অরবিন্দেরা চারি ভাই সকলেই বিলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মা পর্য্যন্ত। তাঁহার ছোট ভাই, আলিপুর বোমার মামলার প্রধান আসামী বারীণ তাঁহার মাতৃদেবীর ইংলণ্ড-যাত্রার সময় ইংলণ্ডের সমীপবর্ত্তী বারিধি-বক্ষে জাহাজের উপর 'ভূমিষ্ঠ' (?) হইয়াছিলেন বলিয়া 'বারীন্দ্র-কুমার' নাম লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ (Dr. K. D. Ghose I. M. S) মহাশয় চালচলনে পুরা সাহেব ছিলেন, ইংরাজের দোষ গুণ উভয়ই তাঁহাতে ছিল। তিনি বহুদিন রঙ্গপুরে, তাহার পর খুলনায় সিভিল সার্জ্জনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; উভয় স্থানেই তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই

তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তিনি অগণ্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহা দুই হাতে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন; মৃত্যুকালে সন্তানগণের জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর অরবিন্দ ও তাঁহার অগ্রজ সুকবি মনোমোহনকে বিলাতে বড়ই অর্থ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। অরবিন্দ বলিতেন, পাওনাদারগণের তাগাদায় এক এক সময় তাঁহাদের ঘরের বাহির হওয়াও কঠিন হইত। কিন্তু তাঁহারা দুই ভাই কেবল প্রতিভা ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে সেই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সসম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া মনোমোহন গবর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি প্রতিভাবলে কবি বলিয়া ইংরাজ-সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। এ দেশের অনেকেও তাঁহাকে সুকবি বলিয়া জানেন। কিন্তু তিনি কোনদিন বাঙ্গলা কবিতা লিখিয়া তাঁহার প্রতিভার অসম্মান করেন নাই! অরবিন্দের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর বিনয়কুমার কুচবিহার রাজ্যের কোনও সম্ভ্রান্ত রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অরবিন্দ সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশের অধিকার পাইলে এতদিন কোনও জেলার জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেন; বরোদার রাজকর্ম্মে নিযুক্ত

থাকিলেও এতদিনে তাঁহার মাসিক বেতন দুই তিন হাজার টাকা হইত; কিন্তু অরবিন্দ চিরদিনই অর্থকে তুচ্ছ মনে করিয়া আসিয়াছেন। আমি যে সময় বরোদায় ছিলাম, সে সময়েও অরবিন্দ অনেক টাকা বেতন পাইতেন। তিনি একা মানুষ, বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না, একটি পয়সারও অপব্যয় ছিল না; তথাপি মাসের শেষে তাঁহার হাতে এক পয়সাও থাকিত না। অনেক সময় তাঁহাকে বন্ধুগণের নিকট টাকা ধার করিতে দেখিয়াছি! তিনি বেতন পাইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মাতা ও ভগিনীকে খরচের টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার ভগিনী তখন বাঁকীপুরে 'অঘোর পরিবারে' থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। কখন কখন অসময়েও তাঁহাদের কাছে অরবিন্দকে মনিঅর্ডার করিতে দেখিয়াছি।

একদিন কথায় কথায় আমি অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম "আপনাকেই ত মাসে মাসে আপনার মাকে ও ভগিনীকে টাকা পাঠাইতে দেখি, আপনার দুই দাদাও ত অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা উঁহাদের জন্য খরচপত্র পাঠান না?" —অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, তাঁহার বড় দাদা খেয়ালী লোক, তাঁহার হাতে পয়সা থাকে না; একা মানুষ, তথাপি তিনি খরচে কুলাইয়া উঠিতে পারেন না! আর মেজদা' নূতন

বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার ধারণা বিবাহটা 'ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা'; অরবিন্দ expensive luxary শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। মা পাগল, সময়ে সময়ে তাঁহাকে ঘরে পুরিয়া রাখিতে হইত; কিন্তু মায়ের প্রতি অরবিন্দের অসাধারণ ভক্তির পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক এক সময় তিনি হাসিয়া বলিতেন, 'আমি পাগল মায়ের পাগ্‌লা ছেলে!' তাঁহার সহোদরা তাঁহার মাস্‌তুতো ভগিনী প্রভৃতি সকলকেই তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; তাঁহাদিগকে পত্রাদি লিখিতেন, টাকা পাঠাইতেন্।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। একদিন অরবিন্দ তাঁহার মাকে কি ভগিনীকে—ঠিক মনে নাই—টাকা পাঠাইবার জন্য মনিঅর্ডারের 'ফরম' পূরণ করিতেছিলেন। তাহার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই আমি বাড়ীতে টাকা পাঠাইব মনে করিতেছিলাম; কিন্তু অরবিন্দের হাতে যথেষ্ট টাকা আছে কি না সন্দেহে তাঁহার নিকট টাকা চাহিতে সঙ্কোচ হইতেছিল। তিনি 'মনিঅর্ডার' করিতেছেন দেখিয়া আমার মনে হইল এই সুযোগে কিছু টাকা চাহিয়া লইয়া আমিও বাড়ীতে পাঠাই। টাকা চাহিলাম। অরবিন্দ হাসিয়া বাক্সের ভিতর হইতে তাঁহার হাতব্যাগটি বাহির করিলেন; ব্যাগে যে স্বল্পাবশিষ্ট টাকা ছিল 'ঝুলি ঝাড়িয়া'

আমাকে দিয়া বলিলেন,"আর ত নাই, এ ক'টা টাকা আপনিই পাঠাইয়া দিন।"—আমি বলিলাম, "সে কি কথা? আপনি টাকা পাঠাইবেন বলিয়া মনিঅর্ডার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে! আপনিই উহা পাঠাইয়া দিন, আমি পরে পাঠাইব।" অরবিন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা হয় না, আমার চেয়ে আপনারই দরকার বেশী, আমি পরে পাঠাইলেও ক্ষতি নাই।"—তাঁহার মনিঅর্ডারের ফরম লেখা অর্দ্ধপথেই বন্ধ হইল। তিনি তাহা টেবিলের এক পাশে ফেলিয়া রাখিয়া মহাভারত খুলিয়া 'সাবিত্রী ও সত্যবানের' উপাখ্যান অবলম্বনে কবিতা লিখিতে বসিলেন।

পরের অভাবকে নিজের অভাব অপেক্ষা গুরুতর মনে করেন—এরূপ মহাপ্রাণ সদাশয় ব্যক্তির কথা ইতিহাসে ও উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি,—কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আর কোথাও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

অরবিন্দের এক কাকা সেই সময় ভাগলপুরের কমিশনরের আফিসের হেড ক্লার্ক ছিলেন। একবার অরবিন্দ কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভাগলপুরে গিয়াছিলেন; কাকার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন, মনে আছে! বস্তুতঃ, পিতৃ-বংশের সহিত অরবিন্দের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া মনে হয় না; তিনি মাতুল ও

মাতামহেরই অধিক ভক্ত এবং মাতৃবংশের পক্ষপাতী ছিলেন। পিতার অভাবে বোধ হয় অধিকাংশ পরিবারে এইরূপই হইয়া থাকে। পিতার আত্মীয় অপেক্ষা জননীর আত্মীয়েরাই অধিক স্নেহ মমতা করেন। দেবর বিধবা ভ্রাতৃজায়ার ভার-গ্রহণে অসম্মত হইতে পারেন, কিন্তু পিতা বা ভ্রাতা কন্যা ভগিনীকে ফেলিতে পারেন না। অরবিন্দ, মাতুল, ভাই, ভগিনী, মাসতুতো ভগিনী, মাসী-মা (সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্নী) প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে পত্রাদি লিখিতেন, কিন্তু পিতৃগোষ্ঠীর কাহাকেও প্রায়ই পত্র লিখিতেন না। ভ্রাতৃগণকেও খুব কম পত্র লিখিতেন। অধিক পত্র লিখিবার তাঁহার অভ্যাস ছিল না, এবং কোনও পত্র একদিনে প্রায়ই শেষ হইত না ; ছোট সাইজের চিঠি লিখিবার 'গ্রে গ্রানাইট' কাগজে কোনও পত্র দশ লাইন, কোনও পত্র বিশ লাইন লিখিয়া ফেলিয়া রাখিতেন ; পরে যেদিন সময় বা খেয়াল হইত, সেই দিন তাহা শেষ করিয়া ডাকে দিতেন। কোনও কোনও পত্র ডাকঘর পর্য্যন্ত যাইত না। খাতার মধ্যেই তাহার পত্র-জীবনের সমাধি হইত! অরবিন্দ বলিতেন, নিজের কথা যত কম প্রকাশ করা যায়, ততই ভাল।— এই জন্যই বোধ হয় তিনি কথাও কম বলিতেন।

বরোদায় অরবিন্দ তেমন জনপ্রিয় (popular) ছিলেন না। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে, প্রতিভা ও জনপ্রিয়তার একত্রসমাবেশ দেখা যায় না। অরবিন্দ সম্বন্ধে এই কথাটি বেশ খাটিত; কিন্তু তথাপি বরোদায় যে দুই চারিজনের সহিত অরবিন্দের বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তেমন অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ মনে হয়। বরোদার যাদব-পরিবারের সহিত তিনি অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিলাতের কৃষি-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ও মহারাজের অন্যতম সুহৃদ, বরোদার সুবা বা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত খাসে রাও যাদব অরবিন্দকে সোদরপ্রতিম জ্ঞান করিতেন; তাঁহার কনিষ্ঠ লেফ্‌টেনাণ্ট মাধব রাও যাদব অরবিন্দের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা প্রায়ই ইংরাজীতে হইত, মারাঠী ভাষাতেও কখনও কখনও হইত। অরবিন্দ মারাঠী ভাষা বেশ বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু ভাল বলিতে পারিতেন না; তবে বাঙ্গলা অপেক্ষা ভাল বলিতে পারিতেন। গল্প করিতে করিতে অরবিন্দ খুব হাসিতেন।

আমরা বরোদায় গিয়া প্রথমে কিছু দিন খাসে রাও সাহেবের ভবনে বাস করিয়াছিলাম। লাল রঙের প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকাটি সদর রাস্তার উপরেই অবস্থিত। বাড়ীখানি বড়ই সুদৃশ্য। সেই সময় রাও সাহেবের পরিবারবর্গ সে বাড়ীতে থাকিতেন না। রাও সাহেব তখন বরোদা রাজ্যের কাড়ি কি আমরেলি 'প্রান্তে'র (জেলার) ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তাঁহার পরিবারবর্গও সেইখানে থাকিতেন। তিনি সেখান হইতে বদলী হইয়া বরোদার 'সুবা' হইলে, আমরা সে বাড়ী ছাড়িয়া অন্য একটি পল্লীতে একজন মুসলমানের 'ওয়াদা'য় বাসা লই। 'ওয়াদা'র সেই উৎকট নামটি এতদিন পরে স্মরণ নাই। আমাদের এই বাসার পাশে কয়েক ঘর মারাঠা গৃহস্থের বাড়ী। সকালে গৃহস্থবধূরা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া দেবালয়ে বা অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতেন; প্রত্যূষে গৃহ-প্রান্তবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে সাজি লইয়া পুষ্পচয়ন করিতেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রবিবর্ম্মার অঙ্কিত ছবিগুলি মনে পড়িত! তাঁহারা অবগুণ্ঠনবতী নহেন, বেশ সপ্রতিভ ভাব; অপরিচিত পুরুষের সম্মুখ দিয়া চলিতে তাঁহাদের পায়ে-পায়ে বাধিয়া যায় না।

তাঁহারা সকলেই নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, কাছা আঁটিয়া, ও খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া যখন অসঙ্কোচে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন মনে হইত, অনেক বিষয়ে তাঁহারা বঙ্গবধূ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা এবং স্বাবলম্বনসম্পন্না।

আমি একদিন অপরাহ্ণে দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া সমাগত বন্ধুগণের গল্প শুনিতেছিলাম; কথায় কথায় আমি বঙ্গললনাদের সহিত মারাঠা মহিলাগণের চরিত্রগত বিশেষত্বের (যে বিশেষত্বটুকু বাহির হইতে দেখা যায়—তাহারই) উল্লেখ করিয়া বলিলাম, মহারাষ্ট্রে অবরোধ প্রথা না থাকায় বঙ্গরমণী অপেক্ষা এদেশের কুলমহিলারা অধিকতর আত্মনির্ভরশীলা, সাহস-সম্পন্না ও সপ্রতিভ। আমাদের মেয়েরা পথে ঘাটে এমন অসঙ্কোচে বেড়াইতে পারেন না; হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিলে তাঁহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা ত দূরের কথা!

আমার কথা শুনিয়া মিঃ ফাড়কে নামক মারাঠা বন্ধু বলিলেন, "আমাদের মেয়েদের কোন নরপশু যে পথে ঘাটে আক্রমণ করিবে—তার যো কি! কিছু দিন পূর্ব্বে একটি মহারাষ্ট্র-মহিলা 'মুম্বই' (বোম্বে) হইতে সুরতে (সুরাট) যাইতেছিলেন। সেখানি লোকাল ট্রেণ, প্যাসেঞ্জার খুব বেশী ছিল না। মহিলাটি যে কামরায় ছিলেন, সেই কামরার আরোহীগুলি 'কল্যাণ জংসনে' নামিয়া যাওয়ায় তিনি

একা রহিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে একটা 'ঐরাবতাকৃতি' পাঠাণ—ইয়া, দাড়ী, ইয়া গোঁফ, চোখে কাজল, মাথায় 'ও'র মত এক প্রকাণ্ড পাগড়ী, আর লম্বা সাড়ে পাঁচ হাত জোয়ান সেই যুবতীর কক্ষে প্রবেশ করিল। সে যুবক, প্রাণে বোধ হয় একটু সখও ছিল। ট্রেণ ছাড়িলে মিঞা দেখিল—সেই কামরায় নীল সাড়ীপরা, কাছা কোঁচা-আঁটা এক রূপবতী যুবতী ভিন্ন আর কেহই নাই! কুক্ষণে ভগবান মকরকেতন বেচারা মিঞার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অব্যর্থ ফুলশর নিক্ষেপ করিলেন। মিঞা তাহার সুরমারঞ্জিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কয়েক মিনিট সেই যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিল; দুই চারিবার ইসারা করিয়া যখন সাড়া পাইল না, তখন সে যুবতীর বেঞ্চিতে গিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল! যুবতী তাহাকে তীব্র ভৎসনা করিয়া বলিল, তাহারও মা ভগিনী আছে, এবং তাহারাও হয় ত রেলের গাড়ীতে ভ্রমণ করে, কোন শয়তান তাহাদের গা ঘেঁসিয়া বসিলে তাহারা কি মনে করিত? কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'—মিঞাজি দন্ত বিকাশ করিয়া বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া দিল, এবং তদ্দারা যুবতীর কণ্ঠালিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল!—আর কোথায় যায়? যুবতী বাঘিনীর মত লাফাইয়া উঠিয়া মিঞাজির

বুকে এমন এক পদাঘাত করিল যে, সেই সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা বিরাট বপু বেঞ্চির উপর কুপোকাৎ! তাহাতেই কি রক্ষা আছে?—সে মিঞার সুরমারঞ্জিত চক্ষুদুটিতে দুই আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া তাহাকে জন্মের মত অন্ধ করিয়া দিল। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে মিঞা আর্ত্তনাদে লোক জড় করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি সে আর ফিরিয়া পাইল না। এই ব্যাপারে তাহার মত কুচরিত্র অনেক মিঞারই দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইল।

আর আমাদের দেশ হইলে কি হইত? দুর্ব্বৃত্ত বঙ্গ-কুলবধূর সর্ব্বনাশ করিয়া পলায়ন করিত, না হয় ধরা পড়িয়া ফৌজদারীতে পড়িত; আর সেই কুলবধূর নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক স্বামী বা ভ্রাতা মাথা নাড়িয়া বলিত,"এই অপবিত্রা কলঙ্কিনীকে গৃহে স্থান দিয়া পবিত্র গৃহ ও নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত করিতে পারিব না" এবং সমাজ বলিত "খবরদার, উহাকে ঘরে উঠিতে দিলে তোমাদের নাপিত পুরুত ও হুঁকো বারণ। বৌটা বাজারে গিয়া ঘর বাঁধুক!"

আমার কথা শুনিয়া কেহ হাসিলেন না; কেবল ঘৃণায় দুই একজনের নাসিকা ঈষৎ সঙ্কুচিত হইল। বোধ হয় আমাদের সমাজ সম্বন্ধে উপস্থিত 'বর্গী' কয়েকটির খুব উচ্চ ধারণাই হইল।

অরবিন্দ কখনও সাজ-পোষাকের পক্ষপাতী ছিলেন না, বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না; এমন কি, রাজদরবারে যাইবার সময়েও তাঁহাকে সাধারণ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই! মূল্যবান জুতা, জামা, টাই, কলার, ফ্ল্যানেল, লিনেন, পঞ্চাশ রকম আকারের কোট, হ্যাট, ক্যাপ,—এ সকল তাঁহার কিছুই ছিল না। কোন দিন তাঁহাকে হ্যাট ব্যবহার করিতে দেখি নাই। যে টুপীগুলি এ দেশে 'পিরালী টুপী' নামে সাধারণতঃ পরিচিত, তিনি তাহাই ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার শয্যাও তাঁহার পরিচ্ছদের ন্যায় নিতান্ত সাধারণ ও আড়ম্বরহীন ছিল। তিনি যে লৌহখট্টায় শয়ন করিতেন, ত্রিশ টাকা মূল্যের কেরাণীও সে খট্টায় শয়ন করা অগৌরবের বিষয় মনে করে! কোমল ও স্থূল শয্যায় শয়নে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। বরোদা মরুসন্নিহিত স্থান বলিয়া সেখানে শীত গ্রীষ্ম উভয়ই অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু মাঘ মাসের শীতেও অরবিন্দকে কোনও দিন লেপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই! 'কম্বলবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' – অরবিন্দ অল্প মূল্যের সাধারণ কম্বলে লেপের অভাব পূর্ণ করিতেন। পাঁচ সাত টাকা মূল্যের একখানি নীল আলোয়ান তাঁহার শীতবস্ত্র ছিল। যত দিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি,

তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য-নিরত পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না; যেন জ্ঞানসঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্ম্মকোলাহলমুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন!

এমন অদ্ভুত পাঠানুরাগ আমি আর কাহারও দেখি নাই। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাব্যালোচনায় রত থাকিতেন বলিয়া অরবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইতে একটু বেলা হইত। চারি পাঁচ টাকা মূল্যের একটা মুখখোলা 'ওয়াচ' সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিত; পড়িবার টেবিলে একটি ছোট 'টাইমপীস্' ঘড়ি থাকিত। অরবিন্দ সকালে চা খাইয়া কবিতার খাতা খুলিয়া বসিতেন। এই সময়ে তিনি মহাভারতের অনুবাদ করিতেছিলেন। বাঙ্গলা ভাল বুঝিতে না পারিলেও, সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত তিনি সুন্দর বুঝিতে পারিতেন! তিনি ধারাবাহিকরূপে অনুবাদ করিতেন না। মহাভারতের এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেন; ইংরাজীর নানা ছন্দে কবিতা লিখিতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তাঁহার ইংরাজী কবিতাগুলি সরল ও মধুর; বর্ণনা অতি পরিস্ফুট ও অতিরঞ্জন-বিরহিত। শব্দ-চয়নের শক্তিও তাঁহার অসামান্য। তিনি কখনও শব্দের অপপ্রয়োগ করিতেন না। ছোট আকারের

'গ্রে-গ্রানাইট' রঙের চিঠি-লেখার কাগজে প্রথমে কবিতাগুলি লিখিতেন; প্রায়ই কাটাকুটি করিতেন না। লিখিবার পূর্ব্বে সিগারেট টানিতে টানিতে খানিকটা ভাবিয়া লইতেন; তাহার পর তাঁহার লেখনীমুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া লেখনীকে বিরাম দিতেন না। সে সময় কেহ তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হইতেন; কিন্তু সে বিরক্তি অন্যে বুঝিতে পারিত না। অরবিন্দকে কখনও রাগ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। কোন রিপুকেই তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যাইত না। বিস্তর সাধনা ভিন্ন মানুষ এরূপ আত্মজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। যে দিন তাঁহার কবিতা মনের মত সুন্দর হইত, সে দিন তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখিতাম। এক একদিন কোন কোন কবিতা আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন; তাহা মূলানুগত হইয়াছে কি না, বুঝাইবার জন্য রামায়ণ বা মহাভারত খুলিয়া মূল কবিতাও পড়িতেন। ব্যাস অপেক্ষা আদিকবি বাল্মীকির তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, ইহাই তাঁহার ধারণা। কবিত্বে বাল্মীকির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একবার তিনি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহা এদেশের বা বিলাতের

কোনও ইংরাজী মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই। তিনি বলিতেন, "মহাকবি দান্তের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, হোমারের 'ইলিয়াদ' পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম ;—ইউরোপের সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। কিন্তু কবিত্বে বাল্মীকি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রামায়ণের তুল্য মহাকাব্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।"

বেলা প্রায় দশটা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিয়া অরবিন্দ স্নানাগারে প্রবেশ করিতেন। স্নানের পর পুনর্ব্বার খাতা লইয়া বসিতেন. এবং সকালে যতটুকু লেখা হইত, তাহারই আবৃত্তি করিতেন। কোনও কোনও ছত্র দুই তিন বার পাঠের পর, আবশ্যক মনে হইলে, তাহার দুই একটি শব্দের পরিবর্ত্তন করিতেন। এগারটার পূর্ব্বেই টেবিলে খানা আসিত। আহার করিতে করিতে অরবিন্দ সংবাদপত্র দেখিতেন। বরোদা রাজ্যের খাদ্য আমার মুখে রুচিত না; কিন্তু অরবিন্দ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। এক একদিন রান্না এমন কদর্য্য হইত যে, তাহা মুখে তুলিতে পারা যাইত না! কিন্তু অরবিন্দ অকুণ্ঠিত ভাবে তাহা গলাধঃকরণ করিতেন; পাচকের নিকট এক দিনও তাঁহাকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। তিনি বাঙ্গালা দেশের রন্ধনেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন; অনেক সময় আমাদের দেশী রান্নার প্রশংসা

করিতেন। একটা তরকারী, ভাজা, ডাল, মাংস বা মাছ, রুটী ও ভাত,—ইহাই প্রত্যহ খাইতে হইত। ভাতের পরিমাণ কম, রুটীর পরিমাণ অধিক। ভাতটা যেন একটা উপলক্ষমাত্র - না হইলেও তাঁহার চলিত, মনে হয়! প্রত্যহ দুই বেলা মাংস অসহ্য মনে করিয়া, একবেলা মাংস ও অন্য বেলা মাছ খাইতেন। ঠাকুর কোনও কোনও দিন চাটনীও করিত; কিন্তু হয় তাহাতে ঝাল, না হয় লবণ বেশী দিয়া লেহনের অযোগ্য করিয়া তুলিত। পাচক যে ভাবে মাংস রাঁধিত, তাহা 'কারিও' নহে, 'কালিয়াও' নহে,—না ঝোল, না চড়চড়ি; অতিরিক্ত মশলা দিয়া সে তাহা অখাদ্য করিয়া তুলিত। শুষ্ক নারিকেল-বাটা মহারাষ্ট্রখণ্ডে প্রধান মশলা; প্রায় কোনও তরকারীতেই তাহা বাদ পড়িত না! বরোদায় আমরা প্রচুর পরিমাণে মৌরুল্লা মাছ ও 'ঝিঙ্গা' অর্থাৎ গল্‌দা চিংড়ি পাইতাম, মূল্যও সুলভ! রুই, মৃগেল প্রভৃতি মাছও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইত। কিন্তু কোনও মাছই আমাদের দেশের মাছের মত সুস্বাদ নহে। সামুদ্রিক মৎস্যও কখনও কখনও আমদানী হইত, কিন্তু তাহার আঁস্‌টে গন্ধে বমনোদ্রেক হইত।

অরবিন্দ বাঙ্গালী পাচকের রন্ধনের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া একবার আমরা দেশে আসিয়া একটি বাঙ্গালী

'ঠাকুর' সংগ্রহ করিয়াছিলাম ; ঠাকুরটির বাড়ী ছিল—বাঁকুড়া জেলায়। বয়স অল্প, একটু adventureএর spirit ছিল বলিয়াই সে আমাদের সঙ্গে অত দূরে যাইতে রাজী হইয়াছিল ; বরোদায় গিয়া তাহার রন্ধনের নমুনা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, দেশে তাহার চাকুরী জুটিবার আশা ছিল না বলিয়াই সে আমাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়াছিল ; কিন্তু অরবিন্দ তাহার রান্নাই মুখ বুজিয়া খাইতেন। ইহাতে ঠাকুরের উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর মিঃ শশীকুমার হেশ মহাশয় ইংলণ্ড হইতে বরোদায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথা পরে বলিব। অরবিন্দ তাঁহাকে ও কয়েকটি বন্ধুকে নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করেন।—ঠাকুর ইংরাজী বুঝিত না, অরবিন্দও তখন ভাল করিয়া বাঙ্গলা বলিতে পারিতেন না ; অরবিন্দের অভিপ্রায় অনুসারে ঠাকুরকে বুঝাইয়া দিলাম—দেশী রান্না,—পোলাও, কালিয়া, কোর্ম্মা, ডাল্‌না, টক্, প্রভৃতি রাঁধিতে হইবে ; পারিবে কি না জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিল, "ঘি মস্‌লা পাইলে কি না পারি ?"—অরবিন্দের গুজরাটী ভৃত্য কেষ্টা ঘি মসলা প্রচুর পরিমাণে জোগাড় করিয়া দিল। ঠাকুর রন্ধন কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য মাছ, গল্‌দা চিংড়ি সমস্তই ঘি দিয়া ভাজিয়া লইল। তাহার পর আহারের সময় আঁস্‌টে গন্ধে প্রাণ

যায় আর কি! আহার অসম্পন্ন রাখিয়াই উঠিতে হইল। অন্য মনিবের হাতে পড়িলে ঠাকুরকে সেদিন দু'এক ঘা পিঠে খাইতে হইত; কিন্তু অরবিন্দ তাহার রন্ধন কৌশলের পরিচয়ে হাসিয়াই অস্থির!

আমাদের সেই ঠাকুরটি দীর্ঘকাল আমাদের সঙ্গে বরোদায় বাস করিতে পারে নাই। সে সেদেশের লোকের কথা বুঝিতে পারিত না, কাহারও সহিত গল্প করিবারও সুবিধা পাইত না; জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়—বাঁকুড়াবাসী ঠাকুরটির অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হইয়াছিল! এক একদিন অপরাহ্ণে সে গৃহ-প্রান্তবর্ত্তী চন্দন-তরুর ছায়ায় বসিয়া একাকী গলা ছাড়িয়া গান ধরিত, "যা রে কোকিলা আমার প্রাণ-বঁধু যেখানে!"—প্রণয়িনী-বিরহ-বেদনাকুল ঠাকুরের রাসভকণ্ঠের উচ্ছ্বাস শুনিয়া অরবিন্দ বড় আমোদ বোধ করিতেন; কিন্তু তাহার প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার কোমল হৃদয় ভরিয়া উঠিত, তিনি বলিতেন, "আহা, এখানে বেচারার বড় কষ্ট হইতেছে।" কয়েক মাস পরে, আমরা দেশে আসিবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। তাহার পর সে আর বরোদায় যায় নাই। ঠাকুরের অভাবে আমরা একটি 'ঠাকুরাণী' সংগ্রহ করিয়াছিলাম; সে বয়সে

প্রবীণা, সাজ পোষাকে আয়ার মত। এই 'ঠাকুরাণী'টি গুর্জ্জরী।

প্রথম হইতেই অরবিন্দের একটি অজাতশ্মশ্রু ভৃত্য ছিল; তাহার নাম 'কেষ্টা,' সাধুভাষায় 'কৃষ্ণ'। তাহার রং দেখিয়াই মা বাপে বোধ হয় এই নামকরণ করিয়াছিল; এ রকম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না! তাহার দুই প্রকোষ্ঠে রূপার বালা, কানে মাকৃড়ি; দন্তগুলি এরূপ বৃহৎ যে, তাহার অধরোষ্ঠের সাধ্য ছিল না—সেগুলি ঢাকিয়া রাখে। রবি বাবু তাঁহার 'রাজা ও রাণী' নাটকে বৃদ্ধ ত্রিবেদী ঠাকুরের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, তাঁর 'সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড!'—কেষ্টা সম্বন্ধে এই উক্তি আঠার আনা খাটিত। অরবিন্দের নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও কাছে সে তিন দিনও চাকরী করিতে পারিত কি না সন্দেহ। কেষ্টার অনন্ত গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কেষ্টা বাজার করিত। একদিন সে এক পয়সার (বরোদা গবর্মেণ্টের টাঁকশালের পয়সা নাম, 'বাবসায়ি' পয়সা, আমাদের দেশের তিন পয়সা 'বাবসায়ি' চারি পয়সার সমান, এই পয়সাই বরোদার হাটে বাজারে প্রচলিত) পাতি লেবু কিনিয়া আনিল। লেবুর আকার দেশী কুল অপেক্ষা একটু

বড়! বুঝিলাম সে আধ পয়সা লাভ করিয়াছে। কয়েক দিন পরে আমি অপরাহ্নে বেড়াইতে বাহির হইয়া, একটা দোকানে বেশ বড় বড় পাতি লেবু দেখিয়া এক পয়সার কিনিয়া আনিলাম; আমি মারাঠা গুজরাটী হিন্দি ও বাঙ্গলা-মিশ্রিত স্বরচিত ভাষায় বলিলাম, "হ্যাঁরে কেষ্টা! আমি এক পয়সায় এত বড় বড় তিনটে লেবু পেলাম, আর তুই এক পয়সা দিয়ে সে দিন কি কিনে এনেছিলি?"—কেষ্টা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "আমার লেবু কেমন ছোট! তা দুটোর বেশী এক পয়সায় পাওয়া যাবে কেন?" তাহার কৈফিয়ৎ শুনিয়া অরবিন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

আর একদিন কেষ্টা আম কিনিয়া আনিয়াছিল। গুজরাটের আম সাধারণতঃ সুমিষ্ট; কিন্তু কেষ্টা কোথা হইতে আম আনিয়াছিল তেমন টোকো আম সেদেশে অনেক চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে হয়! একটু মুখে দিয়াই ফেলিয়া দিলাম। পরে একদিন আমি তাহা অপেক্ষা অল্প মূল্যে খুব মিষ্ট আম কিনিয়া তাহা কেষ্টাকে খাইতে দিয়া বলিলাম, "দেখ্ দেখি কেমন আম! আর তুই সে দিন এর তিন গুণ দাম দিয়ে কি আম কিনে এনেছিলি, বেটা ভূত!"—কেষ্টা আমার প্রদত্ত আম্র আস্বাদন করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ইয়া আম্বা ফার গোরে আছে!"—

অর্থাৎ 'এ আম যে অনেক বেশী মিষ্টি।' তাহার কথার মর্ম্ম এই যে, এ রকম মিষ্টি আম ত সস্তা হইবেই, টোকো আম এত কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে ?—কেষ্টা বোধ হয় আমাদিগকে ভারত-প্রবাসী সেকেলে 'হাইল্যাণ্ডার গোরা' মনে করিত! এখানে সেই গল্পটি বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইংরাজ শাসনের প্রথম আমোলে কলিকাতার কেল্লায় কতকগুলি হাইল্যাণ্ডার গোরা পল্টনের আমদানী হইয়াছিল। দেশে থাকিতে তাহারা কখন মশা বা জোনাকী পোকা দেখে নাই; এবং নারিকেলের প্রশংসা শুনিলেও নারিকেলের আস্বাদন লাভ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই! কলিকাতায় আসিয়া একদিন রাত্রে তাহারা মশক-দংশনে অস্থির হইয়া কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া খাটিয়ার উপর পড়িয়া রহিল। কিন্তু মানুষ কতক্ষণ নাক মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে? দম বন্ধ হইবার উপক্রম, তবু মশার ভয়ে মুখ খুলিতে সাহস হইতেছে না। শেষে একটা গোরা মুখের কম্বল একটু সরাইয়া ঘরের এক কোণে একটা জোনাকী পোকা দেখিতে পাইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ, আর রক্ষা নাই; জানোয়ারগুলা আমাদের দেখ্‌তে না পেয়ে লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে এসেছে!"

এই গোরা মশায়দের একদিন নারিকেল খাইবার সখ হইল। তাহারা এক মুদীর দোকানে গিয়া আট দশটা নারিকেল কিনিয়া গোরাবারিকে লইয়া চলিল; নারিকেল কাটিয়া দেখিল, কতকগুলি ছোব্ড়া আর ভিতরে একটি গোলাকার প্রকাণ্ড আঁটি! তাহারা আঁটিগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই ছোবড়াগুলিই চিবাইতে আরম্ভ করিল, দেখিল রস-কষ কিছুই নাই; ছোব্ড়ার ঘর্ষণে জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত হইল! তখন তাহাদের ধারণা হইল—মুদি তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে,—নারিকেলের পরিবর্ত্তে কোন অখাদ্য ফল দিয়াছে। তাহারা মহা ক্ষাপ্‌পা হইয়া মুদীর দোকানে ফিরিয়া গেল। তাহাকে প্রহারোদ্যত হইলে মুদী তাহাদের ক্রোধের কারণ জানিতে পারিয়া, মিষ্ট কথায় তাহাদের ঠাণ্ডা করিয়া একটি নারিকেল ছুলিয়া ছোব্ড়া ফেলিয়া দিল, এবং নারিকেলটি ভাঙ্গিয়া তাহার শাঁস তুলিয়া তাহাদিগকে খাইতে দিল। তখন গোরারা বারিকে ফিরিয়া যে সকল আঁটি রাগ করিয়া নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিয়াছিল তাহা কুড়াইয়া আনিয়া ভাঙ্গিয়া খাইল।—সৌভাগ্যক্রমে কেষ্টা কোন দিন আমাদের ততখানি দুর্দ্দশা করিতে পারে নাই।

অরবিন্দ অত্যন্ত অল্পাহারী ছিলেন। অল্পাহারী ও

মিতাচারী ছিলেন বলিয়াই গুরুতর মানসিক পরিশ্রমেও তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বাস্থ্যের দিকে তাঁহার লক্ষ্যও ছিল। প্রভাতে তিনি প্রত্যহ এক গ্লাস ইসব্‌গুল-মিশ্রিত জল পান করিতেন। ইসব্‌গুল ভিন্ন তাঁহার একদিনও চলিত না। বরোদার বাজারে উহার অভাব হইলে স্থানান্তর হইতেও আনাইয়া লইতেন। ব্যায়ামে তাঁহার অনুরাগ ছিল না, তবে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় এক ঘণ্টা বারান্দায় দ্রুত পায়চারী করিতেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং গান বাজনা জানিতেন না।

অরবিন্দের একখানি 'ভিক্টোরিয়া' গাড়ী ছিল। ঘোড়াটা খুব বড়, কিন্তু চলনে গাধার দাদা! চাবুকেও তাহার গতিবৃদ্ধি হইত না! গাড়ীখানি যে কত কালের—তাহা কেহ বলিতে পারিত না। অরবিন্দের সকলই বিচিত্র! যেমন পোষাক পরিচ্ছদ, তেমনই গাড়ী, তেমনই বাড়ী! অথচ যে টাকা তাঁহার বাড়ীভাড়া লাগিত, সেই টাকায় কলিকাতাতেও ভাল বাড়ী পাওয়া যায়। সংসারজ্ঞান-হীন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় সকলেই তাঁহাকে ঠকাইত। অর্থে যাঁহার মমতা নাই, ঠকিয়াও তাঁহার অনুতপ্ত হইবার অবকাশ নাই। বরোদার ইতর ভদ্র সকলেই মিঃ ঘোষের নাম জানিত। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা সকলেই

তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। বরোদার শিক্ষিতসমাজ তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার সম্মান করিতেন; মারাঠা-সমাজে অরবিন্দ বাঙ্গালীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বরোদার ছাত্র-সমাজে অরবিন্দ দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ অপেক্ষা এই বাঙ্গালী অধ্যাপক ছাত্র-সমাজের অধিকতর সম্মান ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার প্রণালীতে তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল। বরোদা কলেজের কোনও কোনও অধ্যাপক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইতেন; কিন্তু পরীক্ষকগণের নামের তালিকায় কখনও সুপণ্ডিত অরবিন্দের নাম দেখি নাই! বোধ হয়, তিনি এই গৌরবের প্রার্থী ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের কাগজ পরীক্ষা করেন, এ বিড়ম্বনা-ভোগের তাঁহার অবসরও ছিল না। কলিকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কোনও শিক্ষক অরবিন্দের ন্যায় ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন কি না, জানি না।

দেখিতাম, এক একদিন সকালে বা বৈকালে এক এক জন অস্ত্রধারী তুরুকসোয়ার 'লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ' হইতে মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্র লইয়া অরবিন্দের

নিকট উপস্থিত হইত। প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় কোন দিন লিখিতেন, “আজ আপনি মহারাজের সহিত ‘ডিনারে’ যোগদান করিলে তিনি বড় আপ্যায়িত হইবেন।” না হয় লিখিতেন, “মহারাজের সহিত অমুক সময় একবার আপনার সাক্ষাতের কি অবসর হইবে?”—ইত্যাদি।—সময়ের অভাববশতঃ অরবিন্দ কখনও কখনও মহারাজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এমনও দেখিয়াছি! কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহারাজের সহিত একবার সাক্ষাতের জন্য মাসের পর মাস ধরিয়া উমেদারী করিয়া বেড়াইতেন, আর সামান্য ‘স্কুল মাষ্টার’ অরবিন্দ মহারাজের প্রসাদ অপেক্ষা কর্ত্তব্যকে অনেক অধিক মূল্যবান মনে করিতেন!

বাপুভাই মজ্‌মুমদার নামক একজন গুজরাঠী ব্রাহ্মণ ব্যারিষ্টার বরোদায় আসিয়া অরবিন্দের অতিথিরূপে কিছু দিন আমাদের বাসায় ছিলেন। আমাদের বাসায় থাকিতেন বটে, কিন্তু অন্যত্র খাইতেন। লোকটি বড় সুপুরুষ ও অত্যন্ত রসিক। তিনি খুব গল্প করিতে পারিতেন; অনেক মজার মজার গল্প বলিয়া আমাদিগকে আমোদিত করিতেন; এমন কি, গম্ভীরপ্রকৃতি অরবিন্দও তাঁহার গল্প শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিতেন! তিনি রীতিমত পূজা আহ্নিক

করিতেন, এবং মালা ফিরাইতেন। তাঁহার সঙ্গে আমার বড় ভাব হইয়াছিল। তিনি দুই একটা বাঙ্গলা শিখিয়া রাখিয়াছিলেন, যখন-তখন ময়না পাখীর মত সেই বুলি আওড়াইতেন; আমাকে বলিতেন, "বাবু! আপনি কিমন আছো?" "তুমি কলকত্তায় যাবে?" তাঁহার মুখে কলিকাতার প্রশংসা ধরিত না। তাঁহার ছেলেটি তখন বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছিলেন। ছেলে দেশে ফিরিলে বরোদার রাজসরকারে যদি তাঁহার কোন চাকরী বাকরীর সুবিধা হয়, এই চেষ্টায় বাপুভাই বরোদায় আসিয়াছিলেন। অরবিন্দকে তিনি মুরুব্বি ধরিয়াছিলেন। নিজের কিছু হয়, এ চেষ্টাও তাঁহার ছিল। বরোদায় সুবিধা করিতে না পারিয়া বাপুভাই গুর্জ্জরের অন্য একটি রাজ্যে পরে বিচারকের পদ পাইয়াছিলেন; এখন তিনি একটি রাজ্যের প্রধান বিচারপতি। অরবিন্দ কাহারও চাকরীর জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিতে সম্মত ছিলেন না। মহারাজও অরবিন্দকে চিনিতেন; তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতেন, বুঝিতেন, তাঁহার সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মশালায় মাসিক দু'তিন হাজার টাকা বেতনের স্থূলোদর কর্ম্মচারী অনেকে আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় অরবিন্দ সেখানে নাই। এমন গুণগ্রাহী নরপতি ভারতে দ্বিতীয় আছেন কি না সন্দেহ।

তাঁহার সম্বন্ধে অরবিন্দের ধারণা অতি উচ্চ ছিল। অরবিন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মহারাজ একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনের যোগ্য পাত্র। তাঁহার ন্যায় 'পলিটসিয়ান' সমগ্র ভারতে দুর্লভ। আমার মনে হইত, অরবিন্দকে মহারাজের কিছুই অদেয় ছিল না; কিন্তু মহারাজের নিকট অরবিন্দের কিছুই প্রার্থনীয় ছিল না!—আমি একদিন কথাপ্রসঙ্গে অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম, "এখানে দেখিতেছি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অনেক, তাঁহাদের মানসম্ভ্রমও অসাধারণ; আপনি একটু চেষ্টা করিলেই ঐরূপ মানসম্ভ্রমের অধিকারী হইতে পারেন। কত লোকে তেলের ভাঁড় লইয়া আপনার দরজায় ঘুরিয়া বেড়ায়! তাহা না করিয়া, আপনি সম্ভ্রান্ত-সমাজের উপেক্ষা সঞ্চয় করিয়া এ ভাবে এক ধারে পড়িয়া আছেন কেন?" অরবিন্দ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "মান সম্ভ্রম ক্ষমতা প্রতিপত্তিতেই যে সকলে সুখ পায়, এমন নহে; কতকগুলা স্বার্থপর মূর্খের তোষামোদে কি কোনও আনন্দ পাওয়া যায়?" কেবল মূর্খের তোষামোদ নহে, পণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ-খোলা প্রশংসাতেও অরবিন্দকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে দেখি নাই! স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনরী ছাড়িবার—কিছু পূর্ব্বে কি পরে

আমার ঠিক স্মরণ নাই,—বোধ হয়, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষে মহারাজের নিমন্ত্রণে বরোদায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু তিনি অরবিন্দের কবি-প্রতিভার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; বোধ হয়, তাহার কিছু কিছু পরিচয়ও পাইয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় তৎপূর্ব্বে বিলাতে রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্ক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের স্থানবিশেষের অনুবাদ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, দত্ত মহাশয় ইংরাজী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী রচনা অনেক প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখকের রচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল; এবং গদ্যে পদ্যে, উপন্যাসে কাব্যে তাঁহার সমান কলম চলিত। সুতরাং দত্ত মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অরবিন্দের কবিতাগুলি দেখিতে চাহিলে, অরবিন্দ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবেই তাঁহাকে তাহা দেখাইয়াছিলেন। অরবিন্দের কবিতাগুলি পাঠ করিয়া গুণগ্রাহী দত্ত মহাশয় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার এই সব কবিতা দেখিয়া, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে আমি কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছি ভাবিয়া, দুঃখ হইতেছে! তোমার

এই কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমি আমার লেখা কখনই ছাপাইতাম না। এখন মনে হইতেছে, আমি ছেলেখেলা করিয়াছি।”—অথচ দত্ত মহাশয়ের সেই রামায়ণ মহাভারতের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনায় ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিকের স্তম্ভ পূর্ণ হইয়াছিল!—দত্ত মহাশয়ের এই প্রশংসাতেও অরবিন্দকে কিছুমাত্র হর্ষোৎফুল্ল দেখি নাই। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, নিন্দা প্রশংসায় অরবিন্দ চিরদিন সমান নির্ব্বিকার। পরবর্ত্তী কালে মহাবিপদের প্রলয়মেঘ যখন বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার মস্তকের উপর বজ্রনাদ আরম্ভ করিয়াছিল, শয়নে স্বপনে তাঁহার অশান্তি ও উদ্বেগের সীমা ছিল না বলিয়াই সকলের মনে হইত, এবং ভারতের দীনতম হতভাগ্য প্রজাও আপনাকে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল, সে সময়েও অরবিন্দ “ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি,” এই মহাবাণী স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার আরাধ্য দেবতার ধ্যানে তদ্গতচিত্ত হইয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। অন্য যে কোনও ব্যক্তি যে অনলে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত, সেই অগ্নি অরবিন্দকে দগ্ধ করিয়া শ্যামিকাশূন্য ও অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

৩

বরোদা নগরের মধ্যবর্ত্তী ধূলিপূর্ণ জনবহুল পল্লীতে যে প্রকাণ্ড পুরাতন দ্বিতল অট্টালিকায় আমরা এতদিন বাস করিতেছিলাম, সহরে প্লেগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইলে, আমরা সেই বাসা পরিত্যাগ করিয়া নগরোপকণ্ঠে 'কিল্লাদারের বাঙ্গলো'য় আশ্রয় গ্রহণ করি। কিল্লাদার মহাশয়ের নাম আমার এখন স্মরণ নাই ; এবং আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। তাঁহার বিধবাপত্নী বরোদার বর্ত্তমান মহারাজের প্রথম পক্ষের মহিষীর সহোদরা ভগিনী। কিল্লাদার-পত্নী আমাদের সম্মুখে বাহির হইতেন না ; উচ্চ অবরোধের অন্তরালে বাস করিতেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়া ব্রাহ্মণেতর মারাঠা মহিলাগণ অন্তঃপুর হইতে সাধারণতঃ বাহির হন না ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।—কিল্লাদার-পত্নী একটি শিশু পুত্র ও বালিকা কন্যা লইয়া একটি অনতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করিতেন। এই অট্টালিকার হাতা সুপ্রশস্ত। অট্টালিকার এক প্রান্তে বাগান, অন্য প্রান্তে একটি পুষ্পকানন। এই পুষ্পকাননের প্রান্তভাগে খাপ্‌রোলের ছাউনি-বিশিষ্ট একখানি প্রকাণ্ড

বাঙ্গলো। এই বাঙ্গলোখানিতে অর্থাৎ খাপ্‌রোলের আটচালায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বাসা দেখিয়াই আমার চক্ষুঃস্থির!

কিল্লাদার-পত্নীর দাস দাসী ব্যতীত একটি বৃদ্ধ মারাঠা ভদ্রলোক সেই বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি এই মহিলার কোনও আত্মীয় কি না, আমি সে সংবাদ লই নাই; তবে তিনিই যে বিধবার অভিভাবক, ও ছেলে মেয়ে দুইটির friend, philosopher and guide, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ছেলে মেয়ে দুটিকে তিনি লেখা-পড়া শিখাইতেন, এবং পূজা আহ্নিকে দিনপাত করিতেন। লোকটি বড়ই গম্ভীরপ্রকৃতি। আমাদের সেই খাপ্‌রোলের ঘরেই তাঁহার স্নানাগার ছিল। দিবসে দুই তিন বার তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, তিনি এক দিনও আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই! বোধ হয়, আমাকে অবজ্ঞা করিতেন; না হয় দুইটি প্রবাসী বাঙ্গালী যুবককে তাঁহাদের নির্জ্জন পল্লীভবনে অনধিকার-প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমাদের অপরাধ তিনি অমার্জ্জনীয় মনে করিতেন। কারণ যাহাই হউক, তাঁহাকে এইরূপ আলাপবিমুখ দেখিয়া আমিও তাঁহার সহিত কোনও দিন বাক্যালাপ করি নাই; কিন্তু দেখিয়াছি, অরবিন্দের সহিত

কখনও কখনও তাঁহার দুই একটা কথা হইত। অরবিন্দের বন্ধু লেফ্‌টেন্যাণ্ট মাধব রাও যাদবের সহিত এই পরিবারের যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল। বোধ হয়, তাঁহার চেষ্টাতেই আমরা এই খাপ্‌রোলের প্রাসাদে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। এই বাড়ীর জন্য আমাদিগকে বাসা ভাড়া দিতে হইত না।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট মাধব রাও প্রায় প্রত্যহ এক একবার আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিতেন। তিনি আসিলেই কিল্লাদার সাহেবের ছেলে মেয়ে দুটি তাঁহার সঙ্গে আমাদের কাছে আসিত। মেয়েটি বড়; শ্যামাঙ্গী, সুন্দরী, ভাসা ভাসা চক্ষু, নধর শরীর, প্রকৃতি কিছু গম্ভীর; বয়স বোধ হয় নয় দশ বৎসর। ছেলেটির বয়স ছয় সাত বৎসর। সে বড় চঞ্চল, পাতলা, গৌরবর্ণ, বুদ্ধিমান্ ও কৌতুকপ্রিয়; তাহাদের দু'জনকে ভাই ভগিনীর মত দেখাইত না। উভয়ের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বিন্দুমাত্র ছিল না। তাহারা এখন কত বড় হইয়াছে, জীবিত আছে কি না, কে জানে? কেন বলিতে পারি না, কিন্তু এতদিন পরেও এক এক সময় তাহাদের কথা আমার মনে পড়ে। সুদূর প্রবাসে আসিয়া জনসমাজের সংশ্রব শূন্যভাবে সেই নির্জ্জন গৃহে বাস করিয়া, এই ছেলেমেয়ে দুটি দেখিয়া আমার বাড়ীর ছেলে মেয়েদের মনে পড়িত। তাহাদের

আদর করিতে, তাহাদের সহিত গল্প বলিতে আমার বড় আগ্রহ হইত, কিন্তু আমি তাহাদের কথা বুঝিতাম না, তাহারা আমার কথা বুঝিত না। তাহারা বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে এই অপরিচিত প্রবাসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; কখনও কখনও তাহাদের বাগান হইতে দুই একটি ফুল তুলিয়া আনিয়া উপহার দিত। আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, তাহা বোধ হয় তাহারা তাহাদের বৃদ্ধ 'মাষ্টারজী'র নিকট বা লেফ্‌টেন্যান্ট সাহেবের নিকট শুনিয়াছিল; কিন্তু তাহার অধিক তাহারা কিছুই জানিত না। ভাষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমিও তাহাদের কৌতূহল দূর করিতে পারিতাম না। আমার ইচ্ছা হইল, আমি তাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য মারাঠী ভাষা শিখিব।

শ্রীযুক্ত ফাড়্‌কে নামক এক জন নিষ্ঠাবান মারাঠা যুবকের সহিত অরবিন্দের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। পুনার সন্নিহিত কোনও পল্লীতে তাঁহার আদি বাস। তিনি অনেক দিন হইতেই বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে বরোদায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক জন চিত্রকর। বরোদার কলাভবনে তাঁহার চিত্রবিদ্যায় হাতেখড়ি, কি অন্য কোথাও তিনি তুলি ধরিতে শিখিয়া-

ছিলেন, তাহা আমি তাঁহাকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। চিত্রকর ফাড়্‌কেও তাঁহার দাদার সহিত মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। একবার তিনি আমার ও অরবিন্দের ফটো তুলিয়াছিলেন।—তখন আমরা খাসে রাও সাহেবের বাড়ীতে ছিলাম।

অরবিন্দ সিনিয়ার ফাড়্‌কের (তাঁহার পূর্ণ নাম ভুলিয়া গিয়াছি) নিকট মধ্যে মধ্যে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করিতেন। আর একজন পণ্ডিত তাঁহাকে 'মোরি' ভাষা শিখাইতে আসিতেন। 'মোরি' ভাষা মারাঠী ভাষার অপভ্রংশ; যেমন সংস্কৃত ও প্রাকৃত, অনেকটা সেইরূপ। এই ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। তাহার অক্ষরগুলি দেবনাগর অক্ষর নহে। কিন্তু এই ভাষা শিখিবার জন্যও অরবিন্দের কত আগ্রহ! ফাড়্‌কে দেওয়ান সাহেবের আফিসে কেরাণীগিরি করিতেন। অবকাশ পাইলেই আমাদের বাসায় আসিতেন। তিনি সদানন্দ পুরুষ, মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত; খুব তাড়াতাড়ি কথা কহিতেন, এবং বড়ই রহস্যপ্রিয় ছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনাদের ভাষা শিখিব।' আমার কথা শুনিয়া তাঁহার আনন্দ ও উৎসাহ দেখে কে? লেফ্‌টেন্যান্ট মাধব রাও আমাকে 'নভেলিষ্ট' বলিতেন। ফাড়্‌কেও আমাকে সেই

উপনাম প্রদান করিয়াছিলেন! 'নভেলিষ্টে'র জন্ত তিনি একখানি বর্ণ-পরিচয় আনিলেন। দেবনাগরী অক্ষর; বর্ণ-পরিচয়ে বিলম্ব হইল না। বাঙ্গলার ন্তায় মারাঠী ভাষার জননীও সংস্কৃত; উভয় ভাষার শব্দগত সাদৃশ্ত বিস্তর। আমাদের গাছ সে ভাষায় 'ঝাড়'; আমাদের বিড়াল সে ভাষায় 'মাজারু' (মার্জ্জার?)। 'চাতুরী' তাঁহাদের ভাষায় 'সহানাপনা,' আমাদের 'সেয়ানা'ও ঐ অর্থবাচক! আমি খুব উৎসাহেই প্রথম ভাগ পড়িতে লাগিলাম; কিন্তু 'মাজারুর সহানাপনা'র গল্প পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই আমার উৎসাহ শিথিল হইয়া আসিল। অরবিন্দ এক দিন আমাকে বলিলেন, ভাল উপন্যাস লিখিতে হইলে ফরাসী ভাষা জানা আবশ্তক।—শুনিয়া আমি 'ফ্রেঞ্চ ভকাবুলারী' আনাইয়া পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলাম। অরবিন্দই আমার মাষ্টার হইলেন; কিন্তু ফরাসী উচ্চারণের 'মার-প্যাঁচ' দেখিয়া মাসখানেক পরে পিছাইয়া পড়িলাম। আমাকে নিরুদ্যম দেখিয়া অরবিন্দ দ্বিগুণ উৎসাহে জর্ম্মাণ ভাষা শিখিতে লাগিলেন! তাঁহার পাঠাগারে যে কত ভাষার কত রকম কেতাব দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না!

ফাড়্‌কে সাহিত্যসেবী ছিলেন। আমার সহিত পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই তিনি স্বদেশীয় ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-

নন্দিনী'র অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; আমার সহিত পরিচয়ের পর তিনি রমেশ বাবুর 'জীবন-প্রভাতে'র অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। পরে 'জীবন-প্রভাতে'র নাম 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতকরা হইয়াছিল। ফা'ড়্কে বলিতেন,'জীবন-প্রভাতে'র মত উপন্যাস তিনি আর কখনও পাঠ করেন নাই। স্বাধীন মারাঠা জাতির গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, রমেশ বাবু শিব-ছত্রপতির স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনুপম। শিবাজী মহারাজের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি এই উপন্যাস লিখিয়াছেন। 'জীবন-প্রভাতে'র অনুবাদকালে ফাড়্কে কোনও কোনও অংশের ভাষা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আমাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে বলিতেন। আমি ইংরাজীতে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিতাম। তিনি বাঙ্গলা ভাল পড়িতে পারিতেন না ; কিন্তু যেখানে সংস্কৃত পদের বাহুল্য থাকিত, সেই স্থান বেশ সহজেই বুঝিতে পারিতেন। তবে 'নীলদর্পণে'র তোরাপ বা আহুরীর ভাষা তিনি আদপেই বুঝিতে পারিতেন না। 'জীবন-প্রভাতে'র অনুবাদ তিনি ছাপাইয়াছিলেন কি না, জানি না। কারণ, আমার দেশে ফিরিবার পর তাঁহার সহিত কখন পত্র-ব্যবহার হয় নাই। ফাড়্কে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় উদার

মত আমাদের দেশের গোঁড়ামীভক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না।

আমাদের এই নূতন বাসাটি বড়ই নির্জ্জন ছিল। অরবিন্দ আহারান্তে কলেজে চলিয়া যাইলে সেই নির্জ্জন বাসায় একাকী থাকিতে আমার কষ্ট হইত; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইহা আমার সহিয়া গেল। বাসার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ; তন্মধ্যে কয়েকটি চন্দনতরুও ছিল। হনুমান ও কাঠবিড়ালীর দল এই সকল বৃক্ষে আড্ডা করিয়াছিল। হাতার বাহিরে সুদূরবিস্তৃত প্রান্তর, কেবল উত্তর দিকে প্রশস্ত রাজপথ। খাপ্‌রোলের ঘরে বাস করা শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই কষ্টকর! গ্রীষ্মকালে দুঃসহ রৌদ্রে খাপ্‌রা তাতিয়া আগুনের মত হইত। আমি সেই উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভিজা গামছা জড়াইয়া বসিয়া থাকিতাম! আবার শীতকালে এমন কন্‌কনে শীত যে, যেন বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিন্তু অরবিন্দ শীত গ্রীষ্মে সমান নির্ব্বিকার! কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, একদিনও তাঁহাকে কাতর দেখি নাই। এই বাঙ্গলোতে দিনে মাছি ও রাত্রে মশার উপদ্রবে আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া মনে হইত, মশাগুলা আমাকে মাঠে টানিয়া লইয়া গিয়া শোষণ করিবে! ঘরের খাপ্‌রাগুলি পুরাতন;

ঘরখানি বহুদিন অসংস্কৃত অবস্থায় খালি পড়িয়া ছিল। বর্ষাকালে খাপ্‌রার ভিতর দিয়া মেঝেতে টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িত! আমাদের দেশের অনেক বড়লোকের গোশালাও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু এমন কদর্য্য গৃহে বাস করিতে অরবিন্দের বিন্দুমাত্র আপত্তি বা কুণ্ঠা দেখি নাই। তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে দীর্ঘকাল সেই জীর্ণ গৃহে বাস করিয়াছিলেন। অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত দুঃসহ মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, 'জুয়েল ল্যাম্পে'র আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধ-দৃষ্টি অবস্থায় একই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম। যোগনিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য! ঘরে আগুন লাগিলেও বোধ হয় তাঁহার হুঁস হইত না! তিনি এই ভাবে প্রতিদিন রাত্রিজাগরণ করিয়া ইউ-রোপের নানা ভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জর্ম্মাণ, রাশিয়ান ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না। চসার হইতে সুইনবরণ্‌ পর্য্যন্ত সকল ইংরাজ

কবির কাব্যগ্রন্থ তাঁহার পাঠাগারে সঞ্চিত ছিল। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যাস আলমারীতে, গৃহকোণে, ষ্টীলট্রাঙ্কে পুঞ্জীভূত ছিল। হোমারের ইলিয়াদ, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। রুষিয় ভাষার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন কি চিত্র-শিল্পে, কি সাহিত্যে, রুষিয়া একদিন ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। কথাটা আমার নূতন মনে হইত। তিনি কোনও সপ্তাহে দুই একদিন বাঙ্গলা পড়িতেন; আবার দশ পনের দিন ধরিয়া বাঙ্গলা পুস্তক খুলিতেনও না। আমি নিজের কাজে সময় কাটাইতাম। অপরাহ্ণে একাকী নগর-ভ্রমণে বাহির হইতাম; দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বরোদার রেলওয়ে-ষ্টেশন পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতাম। ষ্টেশনে বেড়াইতে আমার বড় ভাল লাগিত; মনে হইত এই স্থানটিই আমার স্বদেশ ও প্রবাসের সংযোগক্ষেত্র। বোম্বাই হইতে কত ট্রেণ আহম্মদাবাদের দিকে যাইত; প্যাসেঞ্জার ট্রেণে কত বিভিন্ন দেশের লোকের মুখ দেখিতে পাইতাম; কিন্তু কখনও একজনও বাঙ্গালীকে দেখিতে পাই নাই! সে সময় এ অঞ্চলে বাঙ্গালীর বড় একটা গতিবিধি ছিল না। বোম্বাইয়ে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই এ দিকে আসিতেন

না। মারাঠী গুজরাটী ও পার্শীদেরই সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম। পার্শী এ অঞ্চলে বিস্তর। ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ সুবেশধারী সম্ভ্রান্ত পার্শী সওদাগর হইতে জীর্ণবস্ত্রপরিহিত মেটে রঙের দরিদ্র পার্শী শ্রমজীবী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর পার্শী নয়নগোচর হইত। পার্শীরা আমাদের সঙ্গে মিশিত না; কিন্তু বরোদার রাজসরকারের স্থূল-বেতনভোগী স্থূলোদর পার্শী কর্ম্মচারীর অভাব ছিল না। অরবিন্দের দুই একজন পার্শী বন্ধু মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন; কিন্তু সাধারণ পার্শী ভদ্রলোকের নৈতিক চরিত্রের প্রতি অরবিন্দের শ্রদ্ধা ছিল না।

বাঙ্গলা একটু ভালরকম শিখিয়া অরবিন্দ, 'স্বর্ণলতা' ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি পুস্তক পাঠে মনসংযোগ করেন। কথোপকথনের ভাষা তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া অনেক অংশ আমাকে ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইত। ইহাতে আমারও যথেষ্ট উপকার হইত। অনুবাদে যদি আমার বিন্দুমাত্রও দক্ষতা জন্মিয়া থাকে তবে ইহাই তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমার পাণ্ডিত্য এত অধিক ছিল না যে, অরবিন্দের মত ছাত্রকে তাঁহার সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট করি। যেখানে আমার বিদ্যায় কুলাইত না, সেখানে বিভিন্ন উপায়ে

তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। প্রতিভাবান্ অরবিন্দ অর্থটা কোনও রকমে বুঝিয়া লইয়া ও স্বয়ং ইংরাজীতে তাহার বিষদ ব্যাখ্যা করিয়া, সেই ব্যাখ্যা ঠিক হইল কি না জানিতে চাহিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিতাম তিনি ঠিকই বুঝিয়াছেন। আমার মনে পড়িতেছে, দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' পড়াইবার সময় একটা ছড়ার ব্যাখ্যা করিতে আমাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল!

"মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্ কচ্,
মামীর পিরীতে মামা হ্যাঁকচ্-প্যাঁকচ্।"

ইহার ঠিক অনুবাদ করা, আমি ত দূরের কথা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক দিগ্‌গজেরও অসাধ্য! বিস্তর চেষ্টা করিয়াও হ্যাঁকচ্-প্যাঁকচটা কি, তাহা অরবিন্দকে বুঝাইতে পারি নাই। 'পিরীতের হ্যাঁকচ্-প্যাঁকচ্' অরবিন্দ বোধ হয় জীবনে বুঝিতে পারিবেন না; পারিলে তাঁহার এ দুর্দ্দশা হইবে কেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দ নিজেই পড়িতেন; বেশ বুঝিতে পারিতেন। বঙ্কিমের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যবধানের উপর স্বর্ণ-সেতু। অরবিন্দ ইংরা-জীতে একটি সুন্দর 'সনেট' লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার

শ্রদ্ধা ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাঙ্গলা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন; আমাকে বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ। অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীও কিনিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের এই কোকিল কবির প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতাই প্রকাশের যোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইত না। আমার বরোদা-গমনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই শ্রদ্ধেয় কবিবরের সহিত আমার পত্র-ব্যবহার ছিল। বরোদা হইতেও আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পত্র লিখিতাম; যথানিয়মে উত্তরও পাইতাম। তাহাতে মধ্যে মধ্যে অরবিন্দের কথাও থাকিত; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত অরবিন্দের সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই, এজন্য তিনি দুঃখও করিতেন। মনে পড়িতেছে, একবার অরবিন্দ দেশে আসিলে আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সমাজপতি মহাশয়ের বাড়ী যাই। সেইবারই অরবিন্দের সহিত সমাজপতি মহাশয়ের প্রথম আলাপ হয়। সমাজপতি মহাশয় তখন হরিঘোষের ষ্ট্রীটে থাকিতেন। 'সাহিত্যে'র আফিসও সেই বাড়ীতেই ছিল। সেই প্রথম পরিচয়ে অল্পভাষী অরবিন্দের

দুই চারিটি কথা শুনিয়াই সমাজপতি মহাশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন অরবিন্দের হৃদয় কি উপাদানে নির্ম্মিত। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় অরবিন্দ বরোদার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় অসিলে স্বদেশপ্রেমিক সমাজপতি মহাশয়ের সহিত তাহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

অরবিন্দ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের পুত্র হইলেও থিয়েটারের নামে তাঁহাকে খড়্গহস্ত হইতে দেখি নাই—যদিও অনেক ব্রাহ্ম লুকাইয়া থিয়েটার দেখেন! কলিকাতায় আসিয়া তিনি দুই একদিন 'ষ্টার থিয়েটারে' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। এক দিন বোধ হয় 'চন্দ্রশেখরে'র অভিনয় দেখিয়াছিলেন! কিন্তু তিনি থিয়েটারে বানর-নাচের পক্ষপাতী ছিলেন না। থিয়েটারে উদ্দেশ্যহীন অশ্লীল অসার নাটকের অভিনয় হয়, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না; কোনও সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকেই বোধ হয় তাহা পছন্দ করেন না। একবার বরোদায় আমি অরবিন্দের সহিত স্থানীয় 'সয়াজি-বিজয়' রঙ্গমঞ্চে একখানি নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। নাটকখানির নাম 'তারাবাঈ'। কবিগুরু সেক্সপীয়রের কোনও নাটকের ভাবাবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। সেই থিয়েটারে পুরুষেরাই দাড়িগোঁফ কামাইয়া রমণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বক্তৃতা ও গানগুলি ভাল বুঝিতে

পারি নাই বটে, কিন্তু সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটগুলি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল, অভিনয়-নৈপুণ্যে ও নৃত্যকলায় বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ মহারাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা অনেক উন্নত।

'স্বর্ণলতা' পাঠ করিয়া অরবিন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চির-প্রবাসী বাঙ্গালীর ছেলে অরবিন্দ বাঙ্গালার গার্হস্থ্য চিত্রে পরিতৃপ্ত হইবেন, ইহা বিস্ময়ের কথা নহে; কিন্তু এই উপন্যাসের শেষাংশ পাঠ করিয়া তাঁহাকে কিছু হতাশ হইতে দেখিয়াছিলাম। 'স্বর্ণলতা' পাঠ করিতে করিতে, শশাঙ্ক-শেখরের গৃহে যেখানে আগুন লাগিল, সেই স্থানে আসিয়া অরবিন্দ পুস্তক বন্ধ করিলেন; বলিলেন, গ্রন্থকার এই স্থানেই গল্পের 'আর্ট' নষ্ট করিয়াছেন। কথাটি কত দূর সঙ্গত সাহিত্যামোদী পাঠক তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

কলিকাতার গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয় হইতে আমি অরবিন্দের জন্য অনেক পুস্তক আনাইতাম। বসুমতী আফিস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই তিনি গ্রহণ করিতেন। তখনও বসুমতীর বাল্যজীবন অতীত হয় নাই; কিন্তু অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে বসুমতীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। বসুমতীর ভাষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তখন সুলেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বসুমতীর সম্পাদক।

শ্রদ্ধেয় জলধর বাবু তখন পাঁচকড়িবাবুর সহযোগিতা করিতেছিলেন। পাঁচকড়ি বাবুর সরস টিপ্পনী পাঠ করিয়া অরবিন্দ খুব আমোদ পাইতেন। তখন একবার কল্পনাও করি নাই, অল্পদিনের মধ্যে পাঁচকড়িবাবু বসুমতীর সংশ্রব ত্যাগ করিবেন, আমাকে বসুমতীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হইবে, এবং অবশেষে তাহার সম্পাদকীয় দায়িত্বভার আমারই দুর্ব্বল স্কন্ধে নিপতিত হইবে! ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে অরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া 'বন্দে মাতরমে'র কর্ণধার হইবার পূর্ব্বেই আমাকে 'বসুমতীর' সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

৪

বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত পুস্তকব্যবসায়ী আত্মারাম রাধাবাঈ সেগুন ও থ্যাকার কোম্পানী অরবিন্দের পুস্তক সরবরাহ করিতেন। তাঁহারা প্রতিমাসে, কখনও কখনও প্রতি সপ্তাহেই নূতন নূতন পুস্তকের সুদীর্ঘ তালিকা অরবিন্দের নিকট পাঠাইতেন; অরবিন্দ সেই তালিকা দেখিয়া পছন্দমত পুস্তকের নাম নির্ব্বাচন করিয়া অর্ডার পাঠাইতেন। বেতন পাইলেই তিনি প্রতিমাসে ৫০৲।৬০৲ বা ততোধিক টাকা মনিঅর্ডার যোগে পুস্তকবিক্রেতৃগণের নিকট পাঠাইতেন। তাঁহারা Deposit account systemএ অরবিন্দের বরাতী পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দিতেন। অরবিন্দের পুস্তক কদাচিৎ 'বুক পোষ্টে' আসিত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-বাক্সে বোঝাই হইয়া 'রেল পার্শ্বেলে' পুস্তকগুলি আসিত; এমন পার্শ্বেল মাসে দুই তিনবারও আসিত। অরবিন্দ সেই সকল কেতাব আট দশ দিনের মধ্যে পড়িয়া ফেলিতেন! আবার নূতন নূতন পুস্তকের অর্ডার যাইত। এমন সর্ব্বভুক (Voracious) পাঠক আর কখনও দেখি নাই। পূরে যাঁহারা অরবিন্দকে প্রকাণ্ড রাজদ্রোহী বা বিপ্লববাদের প্রবর্ত্তক মনে

করিয়া তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধদৃষ্টিপাত করিতেন,—এবং হয় ত এখনও করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, অরবিন্দের পুস্তকাগারস্থ সেই অগণ্য গ্রন্থস্তূপের মধ্যে বিপ্লববাদের সমর্থক কোনও গ্রন্থ—revolutionary literature—আমি কোনও দিন দেখিতে পাই নাই! মহামহিমান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনও উক্তি কোনও দিন তাঁহার মুখে শ্রবণও করি নাই। ইংরাজের সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইয়া তিনি গবর্মেণ্টের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন,—এরূপ বিশ্বাস, সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও মনে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই আমার ধারণা। গায়কবাড় মহারাজের অনুগ্রহে অরবিন্দ তাঁহার রাজ্যে উচ্চ পদই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু মহারাজ প্রথমে তাঁহাকে দেওয়ানী কার্য্য-বিভাগেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সেই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতারও পরিচয় দিয়াছিলেন। আফিসের কার্য্যে অরবিন্দের অনুরাগ ছিল না, এই জন্যই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নাই। চাকরীতে অরবিন্দের কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। তিনি

কোনও দিন পদোন্নতির প্রার্থনা করেন নাই। চাকরীর প্রতি যিনি এরূপ বীতস্পৃহ ছিলেন, তিনি সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশ করিতে না পাইয়া গবর্মেণ্টের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? বস্তুতঃ, ইংরাজকে ভারত-ছাড়া করিবার দুরভিসন্ধি যে কোন দিন তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল—তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও দুই-বৎসরের অধিক কাল তাঁহার সহিত দিবারাত্রি এক কক্ষে বাস করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা বুঝিতে পারি নাই। যে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা তাঁহার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল—তাহাতে রাজভক্তিহীনতার আরোপ অসঙ্গত বলিয়াই আমার মনে হইত। তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিরোধ, উদার-প্রকৃতি, ধর্ম্মভীরু, দয়ার্দ্র হৃদয়, পরদুঃখ-কাতর, হিংসাবিদ্বেষ-বর্জ্জিত লোক যে ভীষণ বোমার ষড়যন্ত্রে, বা কোনও জনক্ষয়কর অনুষ্ঠানে কখনও লিপ্ত থাকিতে পারেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়াই আমার মনে হয়। বরোদা রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে দলাদলি ছিল, শুনিয়াছি; কিন্তু অরবিন্দ কোনও দিন সেই দলাদলিতে কোনও পক্ষে যোগদান করিতেন না। তিনি কোনও পক্ষ অবলম্বন করিলে আমি যে তাহা জানিতে পারিতাম না, এরূপ মনে হয় না। এই সকল দলাদলির আলোচনায়

অরবিন্দের সময় নষ্ট করিবার অবসর ত ছিলই না, বোধ হয় তাঁহার সে প্রবৃত্তিও ছিল না। বাগ্দেবীর সেবাই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল; ভারতীর সেবাতেই তিনি নিরন্তর নিরত থাকিতেন।

আমার বরোদা-গমনের পূর্ব্বে অরবিন্দ বোম্বের 'ইন্দু-প্রকাশ' নামক সাময়িক পত্রিকায় কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অন্ধ সেবকগণ তাঁহার অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যুক্তি যেখানে পরাভূত হয়, ক্রোধ সেখানে প্রবল হইয়া উঠে;—ইহা মানব-চরিত্রেরই আদিম দুর্ব্বলতা। শুনিয়াছি, এই সকল প্রবন্ধ-প্রকাশের অব্যবহিত পরে, বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্বর্গীয় রাণাডে মহাশয়ের সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সেই সময় এই সকল প্রবন্ধের কথা লইয়া রাণাডে মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাদানুবাদও হইয়াছিল। বহুদর্শী বিজ্ঞোত্তম মহামতি রাণাডে মহাপণ্ডিত মনীষী হইলেও, তিনিও না কি অরবিন্দের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই! তবে তাঁহার প্রবন্ধে কংগ্রেসের অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় রাণাডে তাঁহাকে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় বিরত হইতে অনুরোধ

করেন ; অরবিন্দ তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি 'ইন্দুপ্রকাশে' কংগ্রেস সম্বন্ধে কোনও কথার আলোচনা করেন নাই। অরবিন্দের এই সকল প্রবন্ধের মর্ম্ম কি, তাহা আমি কখনও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

অরবিন্দকে অনেকে 'এ, এ, ঘোষ এস্কোয়ার' বলিয়া চিঠি লিখিতেন। তাঁহার নামের পূর্ব্বে একটা অতিরিক্ত 'এ' কি কারণে প্রযুক্ত হইত, তাহাও কখনও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই ; এরূপ প্রশ্ন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে ভাবিয়াই জিজ্ঞাসা করি নাই ; সুতরাং আমার এই অনাবশ্যক কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় নাই। কিন্তু শুনিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে তিনি 'একরয়েড্' অরবিন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ, তিনি শৈশবে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে কোনও 'একরয়েড্'-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই নাম-বৈচিত্র্যে বিস্ময়ের কোনও কারণ দেখি না। অনেক বিলাত-ফেরতের নাম এইরূপ উপসর্গ-যুক্ত ; যথা, মাইকেল মধুসূদন, ভিক্টর নৃপেন্দ্রনারায়ণ, শেলী কমলকৃষ্ণ, এলবিয়ন রাজকুমার।—অরবিন্দ স্বদেশে ফিরিয়া এই অনাবশ্যক উপসর্গটা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অরবিন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। মানবজীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব আছে, ইহা তিনি

স্বীকার করিতেন। কোষ্ঠীপত্র দেখিয়া জাতকের জীবনের শুভাশুভ জানিতে পারা যায়, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জ্যোতিষের প্রসঙ্গ উঠিলে আমি এক দিন অরবিন্দকে আমাদের স্বগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। কালীপদ বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইলেও তিনি নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক, জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বারাশত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। আমি অরবিন্দের অনুরোধে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিয়া তাঁহার একখানি জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম। এই কোষ্ঠীর সহিত অরবিন্দের অতীত জীবনের ফলাফল মিলিয়াছিল কি না, তাহা অরবিন্দকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। গ্রীষ্মাবকাশে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আসিলে, আমি বরোদা হইতে ফিরিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বলেন, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে—তিনি এমন কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন যে, তাহা দেখিয়া প্রত্যেক দিবসের ফলাফল পর্য্যন্ত জানিতে পারা যাইবে!—অরবিন্দ সেইরূপ একখানি সুবিস্তৃত কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

আমি আরও কিছুকাল বরোদায় থাকিলে হয় ত তাঁহার এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের দেশের অনেক বড় লোকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ছাত্রটি অসাধারণ ব্যক্তি, তিনি রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেও, তাঁহার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ কষ্ট আছে; গার্হস্থ্য জীবনের সুখ তাঁহার অদৃষ্টে বড় অধিক নাই।" সেই সময় অরবিন্দ বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি বিবাহ করিবেন, বরোদায় তিনি অনেক টাকা বেতনের চাকরী করেন; তাঁহার স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ। তাঁহার অদৃষ্টে গার্হস্থ্য-সুখ নাই! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আমি তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গণনা মিথ্যা নহে; অরবিন্দের ন্যায় অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইয়া আর কাহাকে এত দুঃখ কষ্ট, এত মনস্তাপ সহ্য করিতে হইয়াছে?—'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!'

অনেক পাঠক, 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি'র গল্পটা বোধ হয় জানেন না; এই প্রসঙ্গে তাহা বলিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

এক গ্রামে এক গোস্বামী প্রভু বাস করিতেন, তিনি তান্ত্রিকশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। সামুদ্রিক বিদ্যা, কাকচরিত্র প্রভৃতিতেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। মানুষের কপালের হাড়ের উপর যে হিজিবিজি দাগ থাকে, কাকচরিত্র জানিলে তাহা না কি পাঠ করিতে পারা যায়!

গোস্বামী প্রভুর অনেক শিষ্য সেবক ছিল। একদিন তিনি গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী নদীতীরস্থ শ্মশানের পাশ দিয়া গ্রামান্তরে এক শিষ্যবাড়ী যাইতেছিলেন, এমন সময় কোন বৃক্ষমূলে একটি নরকপাল দেখিতে পাইলেন। নরকপালে সেই হিজিবিজি দাগ দেখিয়া, তিনি সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং কি লেখা আছে, কাকচরিত্র অভিজ্ঞতার বলে তাহার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পাঠ করিলেন, লেখা আছে—

"ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে,
মরণং গোমতীতীরে, 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি' ?"

গোস্বামী মহাশয় বুঝিলেন, লোকটা জীবিত অবস্থায় যেখানে-সেখানে খাইত, হাটের কোনও দোকানে শয়ন করিত, গোমতীতীরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে ;—কিন্তু মরণের পর আর কি হইবে ? কি হইবে জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত

উৎসুক হইলেন। তিনি নর-কপালটা উত্তরীয়ে জড়াইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিলেন; এবং তাহা একটি নূতন হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া, হাঁড়ির মুখ বাঁধিয়া তাহা এক স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন!—এই ঘটনার পর মড়ার মাথাটা তিনি প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া দেখিতেন, কিন্তু তাহার কোনও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেন না।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে অন্য শিষ্যবাড়ী যাইতে হইল; যাইবার সময় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "ঐ নূতন হাঁড়ীটার মধ্যে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইও না; হাঁড়ী খুলিও না, উহার কাছেও যাইও না।"

এই সাবধান-বাক্যে গোস্বামি-পত্নীর কৌতুহল অসংবরণীয় হইয়া উঠিল! কৌতূহলনিবৃত্তি না করিয়া স্থির থাকিতে পারে, এমন স্ত্রীলোক জগতে নাই। গোস্বামি-পত্নী স্বামীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া হাঁড়ী খুলিলেন; বীভৎস দৃশ্যে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু হাঁড়ীর মধ্যে মড়ার মাথা কেন, এবং তাঁহার স্বামী প্রত্যহ একবার করিয়া হাঁড়ি খুলিয়া তাহা দেখেন কেন, মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াও গোস্বামি-পত্নী তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না; অবশেষে তাঁহার ধারণা জন্মিল, ইহা তাহার স্বামীর গুপ্ত প্রণয়িনীর মাথার খুলি, অভাগিনী মরিয়াছে—স্বামী তাহার ভালবাসা এখনও

ভুলিতে পারেন নাই, তাই প্রত্যহ তাহার মাথার হাড়খানা দেখিয়াই শান্তি লাভ করেন! এত সহজ কথাটা এতক্ষণ তিনি বুঝিতে পারেন নাই? ক্রোধ ও ঈর্ষায় সতীর হৃদয়ে দাবানলের সৃষ্টি হইল। তিনি সেই নরকপাল হাঁড়ী হইতে বাহির করিয়া তাহা শত খণ্ডে চূর্ণ করিলেন, তাহার পর সেই অস্থিখণ্ডগুলি জঞ্জালপূর্ণ নর্দ্দামায় নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অভিমানিনী উভয় হস্তের অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া ধরাশয্যায় পড়িয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী গৃহে ফিরিয়া সাধ্বী পত্নীর প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; ব্যপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যেমন হইয়া থাকে—কোনও উত্তর পাইলেন না।—'হায় যুবতী মৌনবতী, বাক্য নাহি সরে!' অবশেষে তিনি হাঁড়ীর সন্ধানে গিয়া দেখিলেন, হাঁড়ী ও নর-কপাল, উভয়ই অদৃশ্য হইয়াছে! তিনি পুনর্ব্বার পত্নীর নিকট আসিয়া নর-কপালের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। এবার পত্নীর অভিমান ভঙ্গ হইল; গৃহিণী ধরাশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকোপে বলিলেন, "তবে রে মিন্‌সে! আমাকে ছাড়া তুই না কি আর কাউকে ভালবাসিস্ নে?"—ইত্যাদি।

অবশেষে গোস্বামী প্রভু নর-কপালের পরিণাম জানিতে পারিলেন; 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি,'—বিধাতা-পুরুষের

স্বহস্ত-লিখিত এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ‘প্রব্লেমের’ সমাধান হইল।

অরবিন্দের বড় দাদা বিনয় বাবুরও না কি জ্যোতিষে যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। এ সম্বন্ধে অরবিন্দ আমার কাছে একদিন একটা বড় মজার গল্প বলিয়াছিলেন। একজন জ্যোতিষী তাঁহার একখানি ‘কোষ্ঠী’ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। জ্যোতিষী কোষ্ঠীখানি দেওয়ার সময় তাঁহাকে কোষ্ঠীর ফল শুনাইয়া ভারি খুসী করিয়াছিল; তিনিও মুক্ত হস্তে তাহাকে অর্থদান করিয়া খুসী করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে বিনয় বাবু তাঁহার বড় মামা যোগীন বাবুকে সেই কোষ্ঠী দেখিতে দিলে, সংস্কৃতজ্ঞ যোগীন বাবু কোষ্ঠীখানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া একটু হাসিলেন। বিনয় বাবু তাঁহার হাসির কারণ জানিতে চাহিলে যোগীন বাবু বলেন, “দেখ তোমার কোষ্ঠীতে যা যা লেখা আছে সবই ভাল, কেবল তোমার চরিত্র সম্বন্ধে একটু খারাপ ইঙ্গিত করিয়াছে। অনন্তর যাহা লেখা ছিল সেই সংস্কৃত শ্লোকটি পাঠ করিয়া তিনি তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। ব্যাখ্যা শুনিয়া বিনয় বাবু রাগিয়া আগুন!—তিনি বলিলেন, ‘গণৎকার বেটা আমাকে ভুলাইয়া বিলক্ষণ দশটাকা হস্তগত করিয়াছে, এ সকল কথা যদি

আগে শুনিতে পাইতাম তাহা হইলে that beggarকে kick করিতাম।—তাঁহার রাগ দেখিয়া যোগীন বাবু ভারি আমোদ পাইয়াছিলেন।

বরোদা ক্যাম্পের যে বাসায় আমরা বাস করিতাম সেই বাসার অন্য অংশে একটি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন, তাঁহার নাম ছিল গোপাল দেশপাণ্ডে। তিনি বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা, কি ঐ রকম একটি বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া বরোদা গবর্মেণ্টে চাকরী লইয়াছিলেন। তিনি রাজস্ব বিভাগে চাকরী করিতেন; তাঁর চাকরী কতকটা ডেপুটী কালেক্টরের চাকরীর মত। বোধ হয় দুই শত কি আড়াই শত টাকা বেতন পাইতেন। লোকটি গম্ভীর প্রকৃতি, লোকের সঙ্গে বড় মিশিতেন না; কখন কখন অরবিন্দের কাছে বসিয়া গল্প করিতেন। বাসায় অনেক লোক আসিত, তাহারা প্রায় সকলে অরবিন্দের কাছেই দরবার করিত; কিন্তু দেশপাণ্ডের কাছে বড় কেহ যাইত না। অনেক বৈষয়িক লোক অরবিন্দকে খুব খাতির করিত, তাহারা তাঁহার প্রতিভার জন্য আদর করিত বলিয়া মনে হয় না। অরবিন্দ মহারাজার বিশেষ স্নেহ-ভাজন ও বিশ্বাসের পাত্র জানিয়াই তাহারা নানাপ্রকার বৈগয়িক সুবিধার জন্য তাঁহার কাছে আসিত। কখন কখন

কোন কোন গুজরাটী বণিক বা মারাঠা সর্দ্দারকে ইউরোপে স্ব স্ব পুত্রের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অরবিন্দের উপদেশ গ্রহণ করিতে যাইতে দেখিতাম।

একবার বোম্বাই হইতে একটি 'বঙ্কেশ্বর' তিনিও দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, নাম মঙ্গেশ—উপাধি ভুলিয়া গিয়াছি, কোন একটা 'ইন্‌সিওরেন্স' কোম্পানীর দালালী করিতে বরোদায় আসেন এবং অরবিন্দকে মুরুব্বি ধরেন—যদি মহারাজা অরবিন্দের অনুরোধে তাঁহাকে দিয়া বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার 'জীবন বীমা' করেন। তৎপূর্ব্বেও মহারাজা বিস্তর টাকার 'জীবন বীমা' করিয়াছিলেন। শুনিলাম মঙ্গেশ স্বর্গীয় বিচারপতি রাণাডের অনুগত ও আশ্রিত ব্যক্তি। অরবিন্দ তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছিলেন।—দুই একদিনের আলাপে বুঝিলাম লোকটি বাচাল ও ফক্কড়। অরবি কে তাঁহার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা বলিয়াছিলাম, শুনিয়া তিনি কেবল হাসিয়াছিলেন, কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই।

এই ভদ্রলোকটির বাক্যাড়ম্বরে আমি বাসায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম! আমি বাঙ্গালী, সুতরাং নিশ্চয়ই কলিকাতার সহিত আমার সংস্রব আছে মনে করিয়া তিনি কলিকাতা সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,

শেষে ঠাকুর বাড়ীর কথা পাড়িলেন। পূজনীয় স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর তখন বোম্বাই অঞ্চলে জজিয়তী করিতেন; সেই উপলক্ষে তাঁহার ও তাঁহার পরিজনবর্গের সহিত এই দালাল মহাশয়ের 'একাত্মভাব' হইয়া গিয়াছিল! ঠাকুর পরিবারের প্রসঙ্গে তিনি এমন ভাবে এই সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার সম্বন্ধে 'গোস্তাকী'পূর্ণ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, লোকটিকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি তখনকার অন্যতম প্রধান বাঙ্গলা মাসিক 'প্রদীপে' তাঁহার একটি চরিত্র-চিত্র প্রকাশ করি। গ্রীষ্মাবকাশে আমরা দেশে আসিলে ঐ প্রবন্ধটি 'প্রদীপে' প্রকাশিত হইয়াছিল। দালাল মহাশয় বাঙ্গলা ভাষা জানিতেন না, অরবিন্দের একটি বরোদা-প্রবাসী বন্ধু মজা দেখিবার জন্য সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া টীকা-টিপ্পনী সহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বিস্তর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিলেন; আমাকে ভয় প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন নাই। বরোদার বর্গী সমাজে হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছিল! কে একটা বাঙ্গালী 'নভেলিষ্ট' তার মত মাতব্বর বর্গীকে মাসিক পত্রে expose করিয়া প্রবন্ধ লেখে!—এত-বড় স্পর্দ্ধা? তিনি মহামান্য বিচারপতি রাণাডের অনুগৃহীত আত্মীয় পরগাছা, তাঁহাকে লইয়া ঠাট্টা! অরবিন্দ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া দেওঘর হইতে আমাকে লিখিলেন, "তুমি করিয়াছ কি!

একেবারে ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিয়াছ! তুমি মঙ্গেশের কাছে ত্রুটি স্বীকার না করিলে অতঃপর বরোদায় গিয়া তোমার নিরাপদে বাস করা কতদূর সম্ভব হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।" শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ জলধর বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া মঙ্গেশকে লিখিলাম, "তুমি আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অন্যায় রাগ করিয়াছ, যে তোমাকে প্রবন্ধটি বুঝাইয়া দিয়াছে, সে তোমাকে রাগাইবার জন্য ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে তোমাকে বিখ্যাত করিবার জন্য ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, অতিরঞ্জিত করিয়া কিছুই লিখি নাই। যাহা হউক, যদি তুমি উহাতে মনে আঘাত পাইয়া থাক, তবে আমাকে ক্ষমা করিবে।" পরে মঙ্গেশের আক্রোশ দূর হইয়াছিল। গ্রীষ্মাবকাশের পর আমি বরোদায় উপস্থিত হইলে অরবিন্দের বন্ধু বরোদার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ খাসে রাও যাদব একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, ছিঃ, তুমি ভারি অন্যায় কাজ করিয়াছ! ভদ্রলোককে কি তাহার table talk ছাপিয়া অপদস্থ করে? ইহা ভদ্রতা সঙ্গত হয় নাই।" বুঝিলাম ক্রোধান্ধ মঙ্গেশ খাসেরাও সাহেবের কাছেও আমার নামে নালিশ করিয়াছিল। কিন্তু অরবিন্দ আমাকে অনুযোগসূচক কোন কথা বলেন নাই; তিনি অপ্রীতিকর কোন কথা বলিলে পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত আমার বরোদা যাওয়া অসম্ভব হইত।

আমি অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম, যে আমাদের দেশের একটি মহাসম্ভ্রান্ত ও আমার শ্রদ্ধাস্পদ পরিবার সম্বন্ধে এরূপ প্রগল্‌ভ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বন্ধু সমাজে চূড়ান্ত ধৃষ্টতার পরিচয় দিতে পারে, তাহার ঠিক ছবি আঁকিয়া দেখানো এমন কি দোষের বিষয়? মঙ্গেশের চরিত্র-চিত্র পাঠ করিয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন; ইহাতে মঙ্গেশ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে একটি দীর্ঘকায় বলবান বাঙ্গালী যুবক একটি লোটা ও লম্বা লাঠী সম্বল করিয়া বরোদা ক্যাম্পে আমাদের বাসায় উপস্থিত হয়! তাহার নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার বাড়ী কোথায়, সংসারে কে আছে, কি উদ্দেশ্যে সে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আমাদের কাছে প্রকাশ করে নাই। প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল—লোকটা হয় ত গোয়েন্দা! তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যাকাণ্ড লইয়া দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র ভয়ানক হৈ-চৈ আরম্ভ হইয়াছিল; বিপ্লববাদীদের সন্ধানে চারি দিকে অসংখ্য গোয়েন্দা ঘুরিতেছিল। অপরাহ্নে আমরা তিন চারিজন বন্ধু রেল-ষ্টেশনে নদীতীরে বা ঘোড়দৌড়ের মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি,—প্রায়ই দেখিতাম দুই একজন অপরিচিত লোক আমাদের অনুসরণ করিতেছে! সন্ধ্যার

পর বাসার বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া বারান্দার বাহিরে গিয়া দেখিয়াছি—একটা লোক আড়াল হইতে চট্ করিয়া দূরে সরিয়া গেল! প্রায়ই এই রকম হইত। সুতরাং আগন্তুক বাঙ্গালী যুবকটিকে গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করা আমার পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু আমার এই সন্দেহ স্থায়ী হয় নাই। আগন্তুকের নিকট শুনিলাম—ইংরাজের ফৌজে বাঙ্গালীর প্রবেশ নিষেধ, এই জন্য সে ভারতের কোন করদ বা মিত্র রাজ্যের সমর বিভাগে প্রবেশ করিবার আশায় বিদেশে বাহির হইয়াছে; কিন্তু রাজপুতনা ও মধ্যভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারে নাই। সৈন্যদলে বাঙ্গালীর প্রবেশের বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকারের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত থাকায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোন সামন্ত নরপতি তাহাকে সিপাহী দলে লইতে সাহস করেন নাই; যেন বাঙ্গালী লড়াই করিতে শিখিলেই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান হইবে! যতীন্দ্রনাথের সাহস, উদ্যম, উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাইয়া অরবিন্দ বিস্মিত হইলেন, এবং সে যাহাতে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে পারে—সেজন্য যথেষ্ট আগ্রহও প্রকাশ করিলেন। ফৌজে বাঙ্গালীর প্রবেশ নিষেধ বলিয়া যতীন্দ্রনাথ স্বীয় বাঙ্গালীত্ব গোপন করিয়া পুরুবিয়া ব্রাহ্মণ সাজিল

এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্দ্য'টুকু উহ্য রাখিয়া 'উপাধ্যায়' এই লাঙ্গুলটুকু নিজের নামে যোগ করিয়া অরবিন্দের বন্ধু লেফ্‌টেনাণ্ট মাধব রাও যাদবের শরণাপন্ন হইল, যদি তিনি দয়া করিয়া তাহাকে সাধারণ পদাতিক সৈন্যরূপেও গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন। অরবিন্দ বলিয়াছিলেন যদি কোন স্বাধীন দেশ হইত, এবং যতীন্দ্রনাথ সমরবিভাগে প্রবেশের সুযোগ পাইত, তাহা হইলে কালে সে বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিত; কিন্তু হায়, বাঙ্গালীর ছেলে মসীজীবি হইবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ না করিয়া অসিজীবি হইবার আশায় সারা ভারত চষিয়া বেড়াইতেছে! তাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কারণ তাহার পরই আমি দেশে চলিয়া আসি। কিন্তু গোয়েন্দার দল যে তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিল—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি বরোদা ত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে কোথা হইতে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম পাইলাম, তাহার উত্তর দেওয়ার খরচা পর্য্যন্ত আগাম দেওয়া হইয়াছিল! টেলিগ্রামে লেখা ছিল—"মিলিটারী যতীন্দ্রনাথ কোথায়, এবং সে কি করিতেছে, জানাও!" এত লোক থাকিতে আমার কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না; আমার নাম ঠিকানাই বা কর্ত্তারা কিরূপে পাইল?

যাহা হউক, এই টেলিগ্রামের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যতীন্দ্রনাথের আর কোন সংবাদও আমি পাই নাই।

আমরা বরোদা ক্যাম্পের বাসায় থাকিতে থাকিতে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশীকুমার হেশ মহাশয় ইউরোপ হইতে চিত্রবিদ্যা শিখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার পৈতৃক উপাধী 'আশ,' কিন্তু উহার ইংরাজী উচ্চারণ ও অর্থ তেমন সম্ভ্রমসূচক নহে বলিয়া শশীকুমার বাবু 'আশে'র 'আ' স্থানে 'হে' ব্যবহার করিতেন; কিন্তু তাঁহার পিতা কৌলিক উপাধি ত্যাগ করেন নাই। স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের বদান্যতাগুণেই তিনি চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে ইউরোপ যাইতে পারিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার কোন গ্রামে একটি বাঙ্গালা স্কুলে শশীকুমার বাবু পণ্ডিতি করিতেন। সামান্য গ্রাম্য স্কুলের গুরু মহাশয় সাহস, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাগুণে ইউরোপ হইতে চিত্রবিদ্যা শিখিয়া আসিতে পারিলেন—ইহা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে! শশীকুমার বাবু যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন তখন তাঁহার বয়সও ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। তিনি ইংলণ্ড হইতে সার্ জর্জ্জ বার্ডউড্ ও দাদাভাই নৌরজীর নিকট সুপারিশ চিঠি

লইয়া মহারাজ গায়কবাড়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়ছিলেন।

শশীকুমার বাবু বোম্বে হইতে বরোদায় আসিয়া অরবিন্দের অতিথি হন নাই; মহারাজেরই আথিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরোদা নগরে মহারাজের যে 'গেষ্ট হাউস' আছে তাহা ইউরোপীয় কেতায় সজ্জিত; একটি সুন্দর পুষ্পোত্থানের মধ্যে সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত অট্টালিকা। মহারাজের সম্ভ্রান্ত অতিথিগণকে সেই অট্টালিকাতে বাস করিতে দেওয়া হয়। শশীকুমার বাবু যতদিন বরোদায় ছিলেন, সেই অট্টালিকাতেই বাস করিয়াছিলেন। তখনও এ দেশে মোটর গাড়ীর প্রচলন হয় নাই; শশীকুমার বাবুর ব্যবহারের জন্য উৎকৃষ্ট গাড়ী ঘোড়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই গাড়ীতে তিনি 'গেষ্টহাউস' হইতে বহুদূরবর্ত্তী 'বরোদা ক্যাম্পে' প্রত্যহ আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিতেন। তাঁহার সহিত প্রথম দিনের আলাপেই আমরা মুগ্ধ হই-লাম; সেই একদিনের পরিচয়েই তিনি আমাদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় না থাকিলেও অরবিন্দের মেসোমহাশয় "সঞ্জীবনী"-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি যখন ইউরোপে

ছিলেন সেই সময় তাঁহার লিখিত বিলাতের পত্র প্রায় প্রতি সপ্তাহে 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হইত। শশীকুমার বাবু চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য অনেকদিন ইটালীর ফ্লরেন্স ও মিউনিক নগরে ছিলেন; প্যারিসেও দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি একটি ফরাসী মহিলার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া মিস্ ফ্লামার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শশীকুমার বাবু সাধারণ সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম; কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলা ফরাসী মহিলার সহিত 'ব্রাহ্মমতে' শশীকুমারের বিবাহ হয়—সাধারণ সমাজের অনেকেই ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রেম তাঁহারা তেমন উদারভাবে ও অনুকূল চক্ষে দেখেন নাই। এজন্য শশীকুমার আমাদের কাছে বড়ই দুঃখ করিতেন। কিন্তু অরবিন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন, এইরূপ বিবাহে আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের লোকদেরও দোষ দেওয়া যায় না। যাহা হউক, মহদাশয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সদাশয়তায় ও অনুগ্রহে মিস্ ফ্লামা নির্ব্বান্ধব কলিকাতায় আসিয়াও বিপন্ন হন নাই, এবং পরে তাঁহাদের বিবাহও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। শশীকুমার বাবু তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত ফরাসী ভাষাতেই পত্র ব্যবহার করিতেন, কারণ মিস্ ফ্লামা বাঙ্গলা বা ইংরাজী

জানিতেন না। শশীকুমার ফরাসী ও ইটালীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও ইংরাজী ভাল জানিতেন না; এমন কি, আমাদের সহিত আলাপ করিবার সময় তিনি বেশ তাড়াতাড়ি ইংরাজী বলিতে পারিতেন না। অরবিন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন, শশীকুমার চিত্রকর এ পরিচয় না পাইলেও তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি বলিতে পারিতেন—এই যুবক চিত্রকর! তাঁহার চেহারায় যথেষ্ট অসাধারণত্ব ছিল। প্রথম দর্শনে সাহেবী পোযাকে শশীকুমারকে আমি বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে পারি নাই; এমন গৌরবর্ণ বাঙ্গালীর ভিতর অল্পই দেখা যায়। অরবিন্দ বলিয়াছেন, শশীকুমারকে দেখিয়া ইটালিয়ান বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার গোঁফ দাড়ি একটু কটা ছিল।

আমি প্রায় প্রত্যহই শশীকুমারের সঙ্গে অপরাহ্নে 'গেষ্ট হাউসে' বেড়াইতে যাইতাম। এক একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের গল্প হইত। অরবিন্দও মধ্যে মধ্যে যাইতেন। তিনি শশীকুমারের স্বদেশপ্রেম, সাহিত্যানুরাগ ও চিত্রকলাভিজ্ঞতার প্রশংসা মুক্তকণ্ঠেই করিতেন; কিন্তু তাঁহার বিলাসপ্রিয়তার সমর্থন করিতেন না। যিনি প্রথম যৌবনে গ্রাম্যস্কুলে পণ্ডিতি করিয়া অনেক দিন কাটাইয়াছিলেন—তাঁহাকে অতদূর বিলাসী হইতে দেখিয়া

আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। অরবিন্দ বলিতেন, এইরূপ বিলাসানুরাগ উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর (Artists) দের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা শশীকুমার অরবিন্দের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অজস্র প্রশংসা করিতেন। তিনি বরোদার 'গেষ্ট হাউসে' অরবিন্দকে দুই তিন দিন সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তুলির দুই একটি টানে মূর্ত্তিখানি যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গের জনসাধারণ তাঁহার চিত্রনৈপুণ্যের কোন পরিচয় পায় নাই। একবার মাত্র বাঙ্গলা মাসিক 'প্রদীপে' তাহার অঙ্কিত একখানি একরঙা চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; কুন্তী ও কর্ণের ছবি—তাহাতে তাহার চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

বরোদায় উপস্থিত হইয়া তিনি রাজপরিজনবর্গের কয়েকখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাণী সাহেবা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ছবি আঁকাইতে দিতে সম্মতা না হওয়ায় তাঁহার তৈলচিত্র অঙ্কিত হয় নাই। যে সময় তিনি এই সকল চিত্রাঙ্কনে রত ছিলেন, সেই সময় বড় লাটের সুপারিশ চিঠি লইয়া একজন ইংরাজ চিত্রকর বরোদায় আসিয়া 'গেষ্ট হাউসে' আশ্রয় গ্রহণ

করে। মহারাজার প্রাসাদে যে সকল বহুমূল্য পুরাতন তৈলচিত্র ছিল তাহার কতকগুলি শ্রীহীন হওয়ায় এই সাহেবটা সেইগুলি বার্ণিস করিবার ভার পাইয়াছিল। শশীকুমার বলিয়াছিলেন কোন আত্মসম্মানজ্ঞানবিশিষ্ট প্রতিভাবান চিত্রকর অন্যের অঙ্কিত চিত্র এইভাবে বার্ণিশ করিতে সম্মত হইত না।

একদিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় শশীকুমার অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আমাদের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া বলেন বার্ণিশ-ওয়ালা সাহেবটার সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত বচসা হইয়া গিয়াছে। সে মাতাল হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে; ভবিষ্যতে সে এরূপ ব্যবহার করিলে তিনি তাহাকে ঘুঁসাইয়া দোরস্ত করিবেন। শশীকুমার তাহার সহিত এক বাড়ীতে বাস করা অসম্ভব মনে করিয়া অরবিন্দকে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলেন। অরবিন্দ মিষ্ট কথায় তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বিদায় করেন, এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন—তিনি রাগের মাথায় হঠাৎ কিছু করিয়া বসিলে সেজন্য পরে তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে, এবং ইহার কোন প্রতিকার হইবে এ আশাও অল্প। অরবিন্দের উপদেশে শশীকুমার ঠাণ্ডা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ ও অভিমান দূর হয় নাই; বিশেষতঃ সাহেবটা

কয়েক দিন পুরাতন ছবিতে তুলি বুলাইয়া যে কয়েক হাজার টাকা লইয়া গিয়াছিল, শশীকুমার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট তৈল-চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার অর্দ্ধেকও পারিশ্রমিক পান নাই বলিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, এবং নিরাশ হৃদয়ে বরোদা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বরোদায় অবস্থান কালে নানাশ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাইতাম ; কিন্তু একটি লোকের কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই! এখনও একটি বৃদ্ধের দাড়িগোঁফ-কামানো বীর মূর্ত্তি আমার মনে গাঁথা আছে।—বিজয়া দশমীর পর বরোদায় একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়,—তাহার নাম "একাদশীর সোয়ারী।"—বহুদিন পূর্ব্বে 'ভারতী'তে ইহার একটি বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই দিন বরোদায় সমুদয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, গাড়ী ঘোড়া, সোনা রূপার কামানবাহী শকট এই শোভাযাত্রা উপলক্ষে নগর ভ্রমণ করে। এই উৎসব দেখিবার জন্য এত লোকের ভীড় হয় যে, রাজপথে ও রাজপথ সন্নিহিত ঘর বাড়ীগুলিতে লোক ধরে না! এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য অরবিন্দের সহিত বাহির হইয়া বরোদা নগরের সাধারণ পুস্তকালয়ের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। শোভাযাত্রা আরম্ভ হইলে সর্ব্বাগ্রে একটি বৃহৎ অশ্বে নিরস্ত্র সৈনিকের বেশে গোঁফ দাড়ী হীন একটি

দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। বোধ হয় অরবিন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি ঐ বৃদ্ধটি হিন্দু না মুসলমান?"

আমি বলিলাম, "দাড়ীগোঁফ-কামানো মুসলমান ত প্রায় দেখা যায় না! হিন্দু হওয়াই সম্ভব।"

কিন্তু জানিতে পারিলাম—তিনি মুসলমান। তাঁহার দাড়ীগোঁফ বিসর্জ্জনের যে গল্প শুনিলাম তাহা ঔপন্যাসিক ঘটনার ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির নাম ভুলিয়া গিয়াছি।—তিনি মলহর রাও গায়কবাড়ের সেনাপতি ছিলেন। মলহর রাও গায়কবাড় বরোদার তদানীন্তন রেসিডেন্ট সাহেবকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগে সিংহাসন-চ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনচ্যুত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার এই সেনাপতি বলিয়াছিলেন, ফৌজের সাহায্যে তিনি মহারাজকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন; ইংরাজের ফৌজ বাধা দিতে আসিলে তাহাদিগকে রাজ্য হইতে হাঁকাইয়া দিবেন। তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহার প্রভু পদচ্যুত ও অপমানিত হইবেন—ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না।

কিন্তু সেনাপতির এই প্রস্তাব বাতুলতার পরিচায়ক মাত্র; ইহার ফলে বরোদা রাজ্য বিধ্বস্ত ও প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বনাশ

হইবে ইহা বুঝিতে পারিয়া মলহর রাও এই অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন না; তখন সেনাপতি মহারাজার পদতলে তাঁহার তরবারি বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেনাপতির বৃদ্ধা জননী তখনও জীবিতা ছিলেন; তিনি মহারাজার ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; পুত্রকে শুষ্কমুখে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া তেজস্বিনী রমণী বলিলেন, "হাঁ রে, তোর রাজার এই বিপদ, আর তুই চোরের মত আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এলি! এ তোর কি রকম আক্কেল? এই রকম করে' কি নিমকের মান বজায় রাখ্‌বি? ফিরিঙ্গীর সঙ্গে লড়াই করে' তাদের হাঁকিয়ে দিয়ে রাজাকে রক্ষা করতে পারলি নে! সেনাপতি হয়েছিস্ কেন?"—সেনাপতি বলিলেন, "কি করব মা! রাজা যুদ্ধ করতে রাজী হ'লেন না। তিনি বল্লেন, 'যে ইংরাজ বাহুবলে হিন্দুস্থান দখল করেছে, অগণ্য যাদের কামান বন্দুক ফৌজ, অসংখ্য যাদের সুশিক্ষিত সৈন্য, আমার এই একমুঠো সৈন্য নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আর আত্মহত্যা করা সমান, আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করব না সেনাপতি!'—সেনাপতি খাস্‌খেল সম্‌সের মহারাজা বাহাদুরের কথা শুনে আমি তাঁর তলোয়ার তাঁর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে চলে' এসেছি মা! রাজার হুকুম ভিন্ন আমি কি করতে পারি বল?"

সেনাপতির জননী বলিলেন, "রাজার কি এখন মাথার ঠিক আছে রে! তুই তাঁর সেনাপতি, তাঁর নিমক খেয়ে আস্‌চিস্‌, আর তাঁর বিপদে তাঁকে বাহুবলে রক্ষার চেষ্টা করলি নে, সেনাপতির কর্ত্তব্য-বিসর্জ্জন করে', তাঁকে বিপদে ফেলে-রেখে চলে' এলি? আর কিছু করতে না পারিস্‌ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারিস্‌ ত? তা না করে' যখন হাতিয়ার ছেড়ে চলে' এসেছিস্‌—তখন তোর আর দাড়ীগোঁফ রাখা শোভা পায় না; তুই দাড়ীগোঁফ কামিয়ে পুরুষের নিদর্শন বিসর্জ্জন কর।"

সেই দিন হইতে সেনাপতি দাড়ীগোঁফ ত্যাগ করিয়াছেন, আর অস্ত্রও ধারণ করেন নাই; তাই আজ উনি দাড়ীগোঁফ-বর্জ্জিত, নিরস্ত্র।

স্বাধীন ভারতের বীরত্বের ও গৌরবের এই শেষ নিদর্শন এই দীর্ঘকাল পরে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান নাই; তাঁহার নশ্বর দেহে সমাধি শয্যায় শায়িত হইয়াছে। কিন্তু এতকাল পরে ভারতের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী, আমার প্রথম যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র গুর্জ্জরের কথা মনে হইলেই অরবিন্দের সৌম্য শান্ত মূর্ত্তির সঙ্গে এই বৃদ্ধ সেনাপতির মুখমণ্ডল স্মৃতির দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। অরবিন্দের সঙ্গে যে দশ দিন বাস করিয়াছে—সে জীবনে তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। আমার পরম

সৌভাগ্য যে, আমি দুই বৎসরাধিক কাল তাঁহার সহবাসে যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।

সমাপ্ত